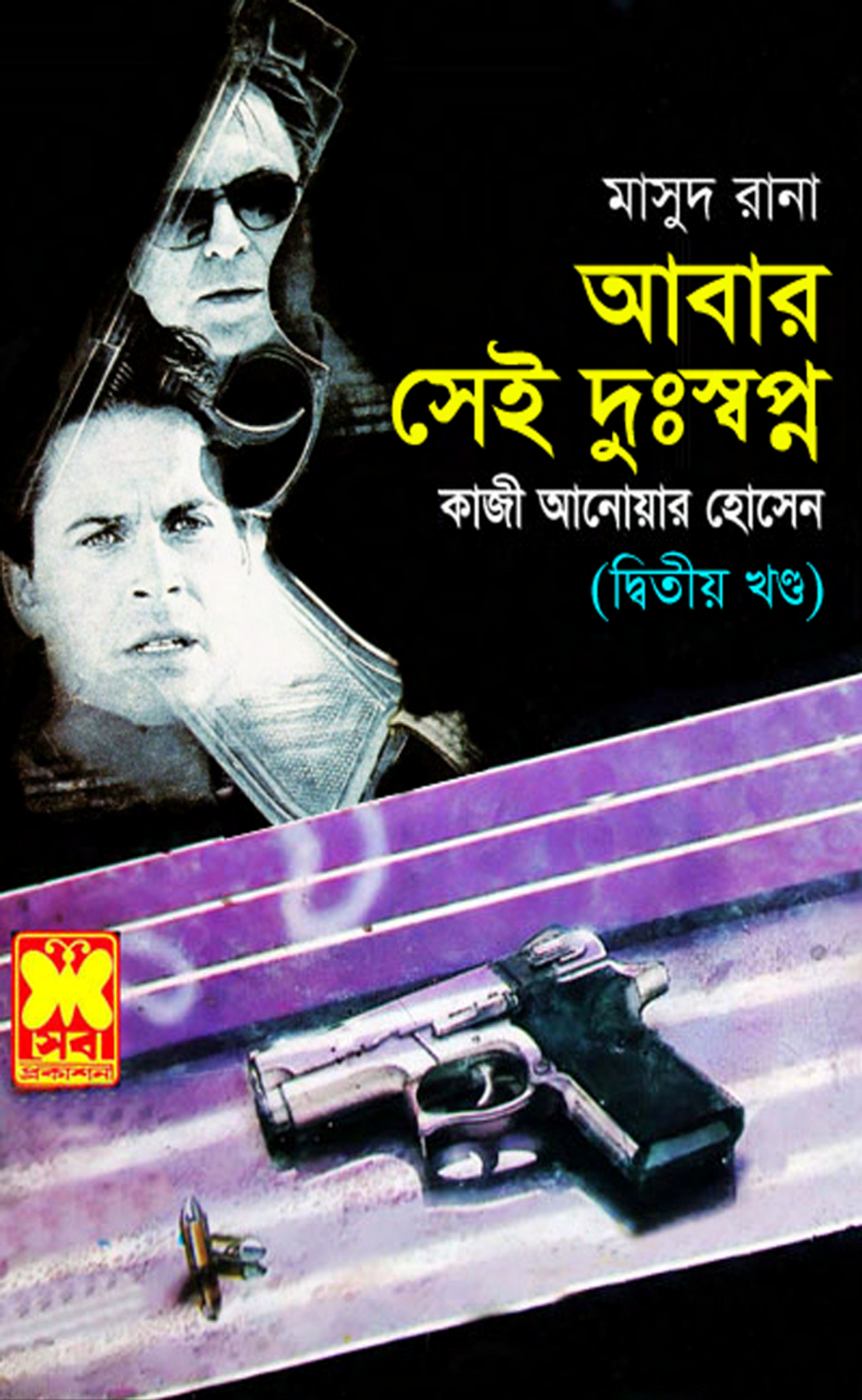

মাসুদ রানা

আবার সেই দুঃস্বপ্ন

কাজী আনোয়ার হোসেন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সেবা প্রকাশনী

আবার সেই দুঃস্বপ্ন-২

পূর্বাভাষ

প্রায় বছর ঘুরতে চললো সংঘবদ্ধ একটা অপরাধী দল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন জেলখানা থেকে দীর্ঘ মেয়াদের সাজা পাওয়া কয়েদীদের কৌশলে বের করে নিয়ে যাচ্ছে তারা।

জেলখানাগুলো এমনিতেই এক একটা দুর্গম দুর্গ, তবু অপরাধী দলটাকে প্রতিরোধ করার জন্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি—চমকপ্রদ নতুন নতুন কৌশলে বার বার কয়েদী ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটতেই থাকলো। প্রতিটি পরিকল্পনা নিখুঁত, আগেরটার সাথে কোনো মিল নেই। কখনো কমাণ্ডো ধরনের হামলা হলো, গ্রেনেড থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার পর্যন্ত সব কিছুই ব্যবহার করলো পনেরো-বিশ জনের দুর্ধর্ষ একটা বাহিনী। আবার হয়তো কখনো দেখা গেল একজন সেপাই জেলখানার ভেতর বাথরুমে উলঙ্গ এবং অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, তার ইউনিফর্ম পরে গেট দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে গেছে কয়েদী—কাছেই একটা গাড়ি অপেক্ষা

করছিল, তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে সেটা। আশ্চর্য ব্যাপার, পলাতক কয়েদীদের একজনকেও পরে আর ধরা সম্ভব হয়নি। জেল থেকে বেরুবার পর তারা যেন স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

একের পর এক ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড উপলব্ধি করলো, এ-ধরনের নিখুঁত প্ল্যান-পরিকল্পনা নিশ্চয়ই দুর্লভকোনো প্রতিভার মাথা থেকে বেরুচ্ছে। গুজব রটলো, সংঘবদ্ধ অপরাধী দলটাকে পরিচালনা করছে কাউন্ট নামে এক রহস্যময় চরিত্র। ধারণা করা হলো কাউন্ট তার ছদ্মনাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও লোকটা সম্পর্কে আর কিছু জানা গেল না। কেউ বললো লোকটা নাকি মিশরীয় মাস্টার ক্রিমিনাল; আবার কেউ বললো কাউন্ট আসলে প্রাক্তন কোনো ভারতীয় রাজা। সবচেয়ে মুখ-রোচক গুজব রটলো, কাউন্ট নাকি আদৌ কোনো মানুষই ওটা একটা অত্যাধুনিক রোবট—যান্ত্রিক মানুষ, কমপিউটার ব্রেনের সাথে দেহকাঠামোর বিস্ময়কর সংযোজন।

কয়েকটা ঘটনা ঘটে যাবার পর একটা প্যাটার্ন পাওয়া গেল। শুধু যাদের দীর্ঘ মেয়াদের সাজা হয়েছে তাদেরকেই বের করে নিয়ে যাচ্ছে কাউন্টের দল। আরো একটা মিল লক্ষ্য করা গেল, প্রায় সব ক'জন কয়েদী ডাকাতি করার পর ধরা পড়েছিল, কিন্তু পুলিশ তাদের কারো কাছ থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করতে পারে-নি। অর্থাৎ যে-সব কয়েদী মোটা অংকের টাকা লুকিয়ে রাখতে পেরেছে শুধু তাদেরকেই বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বুঝতে বাকি থাকলো না, কাউন্ট লোকটা শুধু অর্থলোলুপই নয়, তার

ব্যবসা বুদ্ধিও প্রখর।

প্যাটার্ন পাবার পর কয়েদীদের একটা তালিকা তৈরি করা হলো, এরপর যাদের বের করে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। প্রতিটি জেলখানায় কয়েদীর ছদ্মবেশে নিজেদের লোক ঢোকালো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, কয়েদীদের ওপর নজর রাখবে তারা। কিন্তু পরিকল্পনাটা শুরুতেই কেঁচে গেল। কয়েদীর ছদ্মবেশে থাকলেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভদের দেখামাত্র চিনে ফেললো অপরাধীরা। ফলে কেউ তারা কোনো জেলখানাতেই দু'চার দিনের বেশি টিকতে পারলো না। কয়েদীরা তাদেরকে শুধু যে এড়িয়ে থাকলো তাই নয়, প্রায় প্রত্যেক জেলখানায় ছোটোখাটো দুর্ঘটনার শিকার হলো ছদ্মবেশী ডিটেকটিভরা। কারো মাথায় খালি বালতি পড়লো ছাদ থেকে, পায়ে সরু তার লেগে আছাড় খেলো কেউ, খাবারের সাথে নিজের অজ্ঞাতে কড়া জোলাপ খেয়ে অনেককেই সারা দিনে বত্রিশ বার ছুটতে হলো ল্যাট্রিনে। বাধ্য হয়েই নিজেদের লোককে জেলখানা থেকে ফিরিয়ে নিলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। তবে এবার তারা দু'একটা নগণ্য সাফল্যের মুখ দেখলো বটে।

চিহ্নিত কয়েদীর সাথে জেলখানার ভেতরই অন্য একজন নবাগত কয়েদী যোগাযোগ করলো, একজন ডিটেকটিভের চোখে ধরা পড়ে গেল ব্যাপারটা। তিনটে জেলখানায় এ-ধরনের তিনটে ঘটনা ঘটলো। জেলখানার বাইরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে গ্রেফতার করা হলো আরো দু'জনকে। শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। পাঁচজনই স্বীকার করলো, তারা কাউন্টের লোক,

কিন্তু কাউন্টের ঠিকানা বা পরিচয় সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। টাকার বিনিময়ে ছোটোখাটো কাজ করে দেয় তারা, কাজের প্রস্তাব আসে অচেনা লোকদের কাছ থেকে। দীর্ঘ দিন জেরা করার পর ডিটেকটিভদের বিশ্বাস জন্মালো লোকগুলো সত্যি কথাই বলছে। বোঝা গেল একটা কাজ করার জন্যে এক-জন লোকের যতোটুকু জানা দরকার তার বেশি তাকে জানতে দেয় না কাউন্ট, ফলে লোকটা পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও দলের সাথে বেঈমানী করার কোনো সুযোগ থাকে না তার।

এই যখন অবস্থা, অনেক ভেবেচিন্তে শেষ চেষ্টা হিসেবে কোনো ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের সাহায্য নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো কর্তৃপক্ষ। ফার্মের তালিকা তৈরি হলো, এবং বিস্তর আলো-চনার পর ঠিক হলো কেসটা রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে দেয়া হবে—কারণ, এ-ধরনের কেসে আগেও অনেক কাজ করেছে রানা এজেন্সি, এবং কোনোটাতেই ব্যর্থ হয়নি।

রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একটা কাভার মাত্র। অনেক সময় এমন সব নাজুক পরিস্থিতি বা সমস্যা দেখা দেয় যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সরাসরি সেগুলোর সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে না, পড়লে কূটনীতিক পর্যায়ে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হতে পারে, কিংবা দুর্নামের ভাগীদার হও-য়ার আশংকা থাকে। হয়তো দেখা গেল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স জানতে পেরেছে মিত্র একটা দেশ নিজ স্বার্থ উদ্ধা-রের জন্যে বাংলাদেশের ক্ষতি হবে এমন একটা কাজ গোপনে সারতে যাচ্ছে, তখন বাধা দেয়ার দায়িত্ব চাপে রানা এজেন্সির

ওপর, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই তারা জানে না। রানা এজেন্সি সৃষ্টি করার পিছনে আরো বড় একটা কারণ হলো, দুনিয়ার অন্যান্য গুপ্তচর সংগঠনগুলোকে জানিয়ে দেয়া যে মাসুদ রানা সহ এজেন্সিতে যারা কাজ করছে তারা সবাই বেসরকারী ইনভেস্টিগেটর, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কাভারটা যাতে নিখুঁত হয় তার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি। পৃথিবীর প্রায় সবগুলো বড় শহরে এজেন্সির শাখা অফিস রয়েছে, স্থানীয় যে-কোনো লোক বা যে-কোনো প্রতিষ্ঠান এজেন্সির সাহায্য চাইতে পারে। বিশেষ করে জটিল কোনো কেস রানা এজেন্সি কখনোই ফিরিয়ে দেয় না।

লণ্ডন শাখার ইনচার্জ ছিলো বদরুল হাসান। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্ট গোপনে দেখা করলো তার সাথে। কেসটা সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানানো হলো হাসানকে, ফটো সহ চারজন কয়েদীর চারটে ডোশিয়ে-ও দেয়া হলো তাকে।

চারজন কয়েদীর নাম—জন হেরিক, রিড কোয়েন, রিপ হটন, এবং জো সলোমন। চারজনই কুখ্যাত ডাকাত, পিটারফিল্ড এয়ারপোর্ট ডাকাতির সাথে জড়িত ছিল। আশি লাখ পাউণ্ড সহ একটা প্লেন হাইজ্যাক করে ওরা, প্রত্যেকে বিশ লাখ পাউণ্ড করে ভাগ পায়। তবে কিছু দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যায় ওরা, বিচারে বিশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয় সবার। কিন্তু টাকাগুলো পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।

চারজনের মধ্যে জন হেরিক এবং রিড কোয়েনকে কাউন্টের দল জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে গেছে। সেই থেকে তাদের আর কোনো খবর নেই। সঙ্গত কারণেই ডিটেকটিভ চীফ সুপারিনটেনডেন্ট জ্যাক মারভিনের ধারণা, এরপর হয় রিপ হটন, নয়তো জো সলোমনকে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।

রিপ হটনের চেহারাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো হাসান। শারীরিক গঠন, চোখ আর চুলের রঙ, উচ্চতা, ন্যাকের গড়ন, ঠোঁটের বিস্তার, ইত্যাদি অদ্ভুতভাবে মিলে যায় তার নিজের সাথে। এই মিল লক্ষ্য করেই তার মাথায় একটা বিপজ্জনক আইডিয়া খেলে গেল। রিপ হটনের ওপর নজর রাখার কোনো দরকার নেই, তারচেয়ে সে নিজেই রিপ হটনের ভূমিকায় অভিনয় করবে। রাতের অন্ধকারে, সবার অগোচরে সেল থেকে সরিয়ে দেয়া হবে রিপ হটনকে, তার ছদ্মবেশ নিয়ে সেলে ঢুকবে বদলে হাসান। কাউন্টের লোক যদি যোগাযোগ করে তাহলে রিপ হটন মনে করে হাসানের সাথেই যোগাযোগ করুক। অনেক আলোচনার পর একমত হওয়া গেল, কাউন্টের ঠিকানা এবং পরিচয় জানার জন্যে এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।

পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হলো। রিপ হটনের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে জেল খাটতে শুরু করলো হাসান। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না, সত্যি সত্যি জেলখানার ভেতরে তার সাথে যোগাযোগ করলো কাউন্টের লোক। এবং একদিন তাকে জেল থেকে বেরও করে নিয়ে গেল তারা।

কিন্তু এরপর তার আর কোনো খবর নেই। আর সব পলাতক

কয়েদীর মতো হাসানও যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে।

খবর পেয়ে হেড অফিস ঢাকা থেকে লণ্ডনে ছুটে এলো এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা এবং অপারেশনাল চীফ সোহানা চৌধুরী। লণ্ডন শাখা আসলে কাউন্টের তৎপরতার ওপর গত সাত-আট মাস ধরেই লক্ষ্য রাখছিল, শাখার এজেন্টরা বিস্তারিত একটা রিপোর্টও তৈরি করেছে। সেটা পড়ে শুধু বিস্মিত নয়, চিন্তিত হয়ে পড়লো রানা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের জ্যাক মারভিনের সাথে দেখা করলো ও, তাকে বললো কেসটা নিয়ে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথে আলোচনা করা দরকার। বি. এস. এস. চীফ উইলিয়াম ম্যানফ্রেড সাক্ষাৎ দানে রাজি হলেন। কাউন্টকে ধরার জন্যে, এবং হাসানের খবর পাবার জন্যে একটা পরিকল্পনা তৈরি করলো রানা, সেটা নিয়ে দেখা করলো বি. এস. এস. চীফের সাথে। তাকে বললো, কাউন্ট আসলে পুলিশী কেস নয়, ইন্টেলিজেন্স কেস—কারণ, ব্রিটেনের শত্রুদের কাছে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ টপ সিক্রেট ইনফরমেশন পাচার করছে কাউন্ট। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে ব্রিটেন থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বিজ্ঞানী, সামরিক অফিসার, পার্লামেন্ট সদস্য, এবং স্পাইদেরকে ইসরায়েল, সোভিয়েত রাশিয়া, এবং পূর্ব জার্মানীতে পাচার করেছে সে। স্বভাবতই বিচলিত বোধ করলেন বি. এস. এস. চীফ। রানার প্ল্যানটা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। রানার সাথে তিনিও একমত হলেন, কাউন্টকে ধরতে হলে এই প্ল্যানের কোনো বিকল্প নেই। রানাকে সাহায্য করার জন্যে হোম ডিপার্টমেন্টকে রাজি করাবেন বলে কথা দিলেন তিনি।

চার ডাকাতের তিনজনকেই কাউন্টের সংগঠন জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে গেছে। স্বভাবতই আন্দাজ করা যায়, এর পর চতুর্থজন অর্থাৎ জো সলোমনের পালা আসবে। রানার প্ল্যান হলো, কোথাও ডাকাতি করে ধরা পড়বে সে। বিচারে তার জেল হবে। জো সলোমনের আচরণ দেখে যখন বোঝা যাবে কাউন্টের লোকেরা তার সাথে যোগাযোগ করছে, তখন রানাকেও ফ্রাইডেথর্প জেলখানায় বদলি করা হবে—ওখানেই রাখা হয়েছে সলোমনকে।

ইতিমধ্যে একবার স্ট্রোক হয়ে গেল সলোমনের। একবার হলে, আরেকবারও হওয়ার কথা। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছে, স্ট্রোক সত্যি হয়েছিল, সলোমন অভিনয় করেনি। তাছাড়া, তাদের জানামতে, ড্রাগস ব্যবহার করে কৃত্রিম হার্ট অ্যাটাকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলেও, কৃত্রিম স্ট্রোকের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু রানা লোকটার অসুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলো। ওর জানা ছিলো, হল্যাণ্ডে মাবোফাইন নামে একটা ড্রাগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, যার সাহায্যে কৃত্রিম স্ট্রোকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে।

প্ল্যান অনুসারে কাজ শুরু হলো। ডাকাতি করে জেলে গেল রানা। কিছু দিন পর ফ্রাইডেথর্প কারাগারে বদলি করা হলো ওকে। জো সলোমনের সাথে একই সেলে থাকার ব্যবস্থা হলো।

ছদ্মবেশী রানার পরিচয় হলো সে একজন আফগান যুবক, নাম নাহিদ শাহ, নাগরিকত্ব নিয়ে অনেক বছর হলো লণ্ডনে আছে। ভাড়াটে সৈনিক হিশেবে ক্যাপ্টেন পদে ছিলো সে, হঠাৎ

বড়লোক হওয়ার খায়েসে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। নাঈদ শাহ শিক্ষিত, একজন সৈনিক, এই ব্যাপারটা জো সলোমনকে প্রভাবিত করলো, কারণ সে-ও রয়্যাল নেভীতে ছিলো এক সময়। রানাকে বন্ধু হিশেবেই গ্রহণ করলো সে। ছোটোখাটো কয়েকটা বিপদে সলোমনকে সাহায্য করে সেই বন্ধুত্ব আরো গাঢ় করে নিলো রানা।

কয়েকটা লক্ষণ দেখে রানা টের পেয়ে গেল, সলোমন পালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওকে বিস্মিত করলো প্রিন্সিপাল অফিসার ডানিয়েল বুকার, কাউন্টের প্রতিনিধি হিসেবে সে-ই যোগাযোগ করলো সলোমনের সাথে। নিজের চোখেই রানা দেখলো, বুকার একটা ম্যাচ-বাক্সের ভেতরে করে ক্যাপসুল দিয়ে গেল সলোমনকে। সেই ক্যাপসুল খেয়ে পরদিন অসুস্থ হয়ে পড়লো সলোমন, অর্থাৎ সে বোঝাতে চাইলো আবার তার স্ট্রোক হয়েছে।

স্ট্রোক হওয়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ফ্রাইডেথর্প জেলখানায় নেই, কাজেই সলোমনকে ম্যানিংহ্যাম জেনারেল হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তার সাথে রানাও যেতে চায়, কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া সেখানে যাবার কোনো উপায় নেই। অগত্যা, ইস্পাত শান দেয়ার মেশিনে হাত ঠেকালো রানা, চোখের পলকে নয় ইঞ্চি মাংস দু'ফাঁক হয়ে গেল, রক্তের স্রোত বইলো মেশিন শপের মেঝেতে। অ্যাম্বুলেন্স এলো, দু'জনকেই নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে।

কোনো হাসপাতালেই ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা

সম্ভব নয়। মাত্র দু'জন লোক রানা আর সলোমনের পাহারায় থাকলো। দিন কয়েক পর এক রাতে, ডাক্তারের ছদ্মবেশে ওয়ার্ডে ঢুকলো কাউন্টের একজন লোক। অসুস্থ সলোমন এক নিমেষে সুস্থ হয়ে গেল, ছদ্মবেশী ডাক্তারের সাহায্যে পুলিশ দু'জনকে কাবু করলো সে। ধস্তাধস্তির সময় ডাক্তারের হাত থেকে অটো-মেটিকটা খসে পড়লো। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সলোমন আর ডাক্তারের দিকে তাক করলো রানা, বললো, হয় তাকেও সঙ্গে নিতে হবে, নয়তো কারো যাওয়া হবে না। নানাভাবে রানার কাছে ঋণী হয়ে আছে সলোমন, তার ওপর শেষ মুহূর্তে রানা যদি গোল বাধায় তাহলে তার পালানো হয় না, এই সব চিন্তা করে রানাকে সাথে নিতে রাজি হলো সলোমন। ডাক্তার ইতস্তত করছে দেখে তাকে সে বললো, নাহিদকে বের করার বিনিময়ে প্রাপ্য কি দেয়া হবে কাউন্টকে, তাহলে আর অসুবিধে কি?

সহজেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল, সেটায় চড়ে পালালো তিনজন। কিছু দূর গিয়ে নির্জন এক রাস্তায় ওদের দু'জনকে নামিয়ে দিলো ডাক্তার, বললো ওদেরকে নেয়ার জন্যে কেউ একজন আসবে। লোকটা ওদেরকে জিজ্ঞেস করবে, কোথায় যেতে চান বলুন আপনাদের আমি পৌঁছে দিই। ওরা বলবে, ব্যবিলন। উত্তরে লোকটা বলবে, ব্যবিলন আমার জন্যে খুব দূর হয়ে যায়, তবে পথের খানিকটা আপনাদের আমি এগিয়ে দিতে পারি।

গাড়ি নিয়ে চলে গেল ডাক্তার। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা দু'জন। একটু পর হেডলাইট জ্বেলে একটা

ট্যাংকারকে এগিয়ে আসতে দেখলো ওরা। ওদের পাশে থামলো ড্রাইভার। সাংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা হলো। পেটের ভেতর ওদেরকে ভরে নিয়ে আবার রওনা হলো ট্যাংকার।

প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর আবার নির্জন একটা রাস্তায় ছেড়ে দেয়া হলো ওদেরকে। এবার একটা মেয়ে এলো ওদেরকে নিতে। যুবতী মেয়ে, শরীরে উথলানো যৌবন, কিন্তু দেখতে ভালো না। নাম রোয়েনা। তার সাথেও সাংকেতিক ভাষায় কথা হলো ওদের। পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা ফার্মহাউসে নিয়ে এলো সে।

চিলেকোঠা থেকে ওদেরকে আসতে দেখলো ফার্ম হাউসের মালিক হোফার টুইড। তার পাশেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে গরিলা আকৃতির ডুগান। হোফার লোকটা পেশায় খুনী, তার কাজই হলো কাউন্টের লোকেরা তার কাছে যাদেরকে পাঠায় তাদের খুন করা। কোনো কারণে খুন করা যদি সম্ভব না হয়, কিংবা যদি অন্য রকম নির্দেশ থাকে, কাউন্টের আরেক লোকের হাতে কয়েদীদের তুলে দেয় সে। অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোক আছে কাউন্টের, কেউ কারো সম্পর্কে কিছু জানে না, প্রত্যেকেরই কাজ হলো হাতে কয়েদী এলেই তাদেরকে খুন করা, কোনো কারণে খুন করা সম্ভব না হলে কিংবা অন্য রকম নির্দেশ থাকলে, পরবর্তী লোকের হাতে তাদেরকে তুলে দিতে হবে। অবশ্য খুন করার আগে কয়েদীর কাছ থেকে তার লুকানো টাকার হদিশ ঠিকই জেনে নেয়া হয়।

গরিলা আকৃতির ডুগান হাবা গোছের লোক, গায়ে অসুরের

শক্তি থাকলেও ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই। হোফার টুইডের কথায় ওঠেবসে। কয়েদী খুন করার কাজে টুইড তাকে হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করে। লোকটার ঠোঁটের কোণ থেকে সারাক্ষণ সুতোর মতো লালা ঝরছে।

টুইডের অস্থির, রহস্যময় আচরণ ভালো লাগলো না রানার। ডুগানের উপস্থিতিও কেমন যেন খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিলো ওদের মনে। টুইড অসম্ভব বিনয়ী, কথাবার্তায় হেঁয়ালি ভাব। রানাকে সে জানালো, কাল তার স্ত্রী মারা গেছে। সকালে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা হবে। রোয়েনা মেয়েটা চুপচাপ। টুইড তাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় করিয়ে দিলো। খাওয়া-দাওয়ার পর দোতালার একটা ঘরে শুতে এলো রানা আর সলোমন। দু'জনেই খুব অস্বস্তিবোধ করছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দশ পাউণ্ড ওজনের একটা হাতুড়ি নিয়ে দোতালায় উঠলো ডুগান, সাথে তার মনিব হোফার টুইড। উদ্দেশ্য, কয়েদী দু'জনকে খুন করা। ডাক্তার, অর্থাৎ টেনিসন ওরফে রবার্ট পিয়ারসন ওরফে জনি ইতিমধ্যে টুইডের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিল। তার নির্দেশেই রানা আর সলোমনকে খুন করতে এলো টুইড।

কিন্তু ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে হতাশ হলো তারা। ডুগানকে টুইড বললো, ব্যস্ত হবার কিছু নেই, কাজ সারার আরো অনেক সময় পাওয়া যাবে।

ওদিকে ঘরের ভেতর মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে রানা আর সলোমন। দরজার নব নড়তে দেখলো ওরা, কিন্তু ঘুরলো না।

যেটা। আগেই আশংকা করেছিল রানা, এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে, তাই নিজেও ঘুমায়নি, সলোমনকেও ঘুমাতে দেয়নি। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর সলোমন চাপা কণ্ঠে বললো, 'ভাগ্যিস তুমি সাথে ছিলে, তা না হলে···!' ঠিক হলো, পালা করে জেগে রাতটা কাটিয়ে দেবে ওরা।

গল্পের দ্বিতীয় অংশ শুরু হবে পরদিন সকাল থেকে। কাউন্টের ব্যবসাটা কি, মোটামুটি তা আন্দাজ করে নিয়েছে রানা, অর্ধেক টাকা, স্বাধীনতা, এবং নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে কয়েদী-কে জেল থেকে বের করে আনে সে, লুকানো টাকার হদিশ জেনে নেয়, তারপর তাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করে। সেজন্যেই পলাতক কয়েদীদের একজনকেও পরে আর ধরতে পারে না পুলিশ।

রানাকে এখন জানতে হবে হাসানের ভাগ্যে কি ঘটেছে। সে কি বেঁচে আছে, না মরে গেছে? কাউন্ট সমস্যারও একটা সমা-ধান করতে হবে ওকে। সলোমনের ওপর ওর কোনো দুর্বলতা নেই, আবার কোনো বিদ্বেষও নেই। অর্থাৎ শুধু নিজেকে নয়, সলোমনকে রক্ষা করার দায়িত্বও ওর কাঁধে চাপছে। সলোমন শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি কম।

এরপর কি ঘটবে সে-সম্পর্কে রানা বা সলোমনের কোনো ধারণা নেই। আসুন এখন দেখা যাক ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে নিয়ে যায় ওদেরকে।

এক

পিট পিট শব্দে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে কাঁচে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের উঠনে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। সকালের নিষ্প্রভ আলোয় দৃশ্যটা নোংরা লাগলো। উঠনের এখানে সেখানে ছোটোবড় অনেক গর্ত, নিচে পানি জমায় আবর্জনা-গুলো ভেসে উঠছে। এদিক ওদিক কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি নিয়ে পড়ে রয়েছে ভাঙাচোরা লোহা-লক্কড়, যন্ত্রপাতি, আর বাতিল যানবাহন। গোটা ফার্মহাউস খাঁ খাঁ করছে, প্রাণের কোনো সাড়া নেই কোথাও।

টেবিলের কাছে ফিরে এলো রানা। 'ক'টা বাজে?'

'ন'টা পঁয়তাল্লিশ।'

'টুইড বলে গেছে ওর স্ত্রীকে দশটায় মাটি দেয়া হবে। সাড়ে দশটার মধ্যে ফিরে আসার কথা ওদের।' টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলো রানা। 'তোমার পেট ভরেছে?'

মস্ত একটা ঢেকুর তুললো সলোমন। 'কোনো পুরুষমানুষ

এতো সুন্দর ডিম ভাজতে পারে, আমার ধারণা ছিলো না। কু'টা ডিম খেলাম বলতে পারবো না—চারটে না ছ'টা? তবে পাউরুটি গোটাটাই সাবাড় করেছি।'

'হুটো,' বলে রান্নাঘরের দরজা খুললো রানা, পিছনের উঠন পেরিয়ে চোখ চলে গেল কাছের পাহাড়টার ওপর। পাহাড়ের মাথায় ছোটো একটা পাথুরে ঘর, ঘরটার চারপাশে এক পাল ধূসর রঙের ভেড়া চরছে। 'চারদিকটা একটু হেঁটে দেখে আসা দরকার।'

মুখ তুলে জানালার দিকে তাকালো সলোমন। 'এই বৃষ্টির মধ্যে? তুমি যাও—আমি বরং বাড়িটা সার্চ করি। ভাগ্য ভালো হলে দু'একটা পিস্তল-টিস্তল পেয়েও যেতে পারি।'

'কি মনে করো তুমি টুইডকে? লোকটা জংলী হতে পারে, কিন্তু শেয়ালের চেয়েও চতুর।'

নিচের তালায় নেমে এসে দরজার পিছন থেকে একটা অয়েল-স্কিন কোট নিলো রানা, গলা পর্যন্ত বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এলো বাইরে। আউট হাউসের দেয়াল ঘেঁষে স্তূপ হয়ে রয়েছে এক গাদা মরচে ধরা টিন ক্যান। চলার পথে পড়লো একটা, জুতোর ডগা দিয়ে কিক মারলো রানা। সেটাকে অনুসরণ করে ঢুকে পড়লো গোলাঘরের ভেতর।

আর সব কিছুর মতো গোলাঘরটাও নোংরা, মাসের পর মাস পরিষ্কার করা হয়নি। দরজা আছে, কিন্তু কবাট থেকে কয়েক ফালি কাঠ উধাও। ছাদের গর্তগুলো থেকে বৃষ্টি পড়ছে। পিছনের দরজার কাছে মরচে ধরা লালচে ট্র্যাক্টরের পাশে পুরনো

একটা ক্যাটল ট্রাক দেখা গেল, চেষ্টা করলে সম্ভবত এখনো চালানো যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে টিনের ক্যানটাকে আবার কিক মারলো রানা। উড়ে গিয়ে ভেজা ভেজা খড়ের গাদায় গিয়ে পড়লো সেটা, স্যাঁৎ করে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক জোড়া খয়েরি ইঁদুর, মেঝের মাঝখানে থেমে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। কেন যেন ভয়ানক ঘৃণা বোধ করলো রানা। একটা নুড়ি পাথর তুলে ছুঁড়লো ও। লাগলো না, ছুটে গিয়ে আরেক কোণে খড়ের গাদার ভেতর লুকালো ওগুলো।

পিছনের দরজা দিয়ে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এলো রানা। আগাছায় ঢাকা পড়ে আছে সামনেটা। এককালে বাগান ছিলো, আন্দাজ করলো ও। একটা প্রায়-দার্শনিক চিন্তা খেলে গেল মাথায়—শয়তানের হাত থেকে এমন কি সৌন্দর্য পর্যন্ত নিরাপদ নয়। যা কিছু সুন্দর সবই ধ্বংস করে সে। বিধ্বস্ত-প্রায় পাঁচিলটা টপকে এলো রানা, পায়ে হাঁটা সরু একটা পথ পেয়ে গেল।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছগুলোর ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে পথটা, পাহাড়ী বাঁকগুলোকে অনুসরণ করে প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে চূড়ায়। হঠাৎ করেই রানা উপলব্ধি করলো, পরিবেশটা উপভোগ করছে সে। বৃষ্টি ভেজা পাথর আর মাটি থেকে সোঁদা একটা গন্ধ আসছে, তারই সাথে তাজা বাতাসে মিশে রয়েছে বনফুলের সুবাস। পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠার পরিশ্রমটুকুও আনন্দের পরশ বুলিয়ে দিলো শরীরে। এক-ঘেয়ে বন্দী জীবনের পর উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে স্বাধীন পদ-

চারণা পুলক জাগালো মনে।

পাথুরে একটা পাঁচিল টপকে শেষ ঢালে পৌঁছুলো রানা। বিশাল সব বোল্ডার চারদিকে, কোথাও কোথাও কাছিমের পিঠের মতো ফুলে আছে ঢালের গা, এরই মাঝে চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল। ওর ওপরে, ঘরটার পিছনে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে কাঁটাঝোপ, শাখাগুলো অদ্ভুতভাবে মোচড়ানো, হাড্ডিসার হাতের লম্বা আঙুলের মতো বাতাসের দাপটে সবগুলোই একটামাত্র দিক নির্দেশ করছে।

ফার্মহাউস থেকে ঠিকমতো বোঝা যায়নি, ঘরটা আসলে বেশ বড়সড়। ভেতরে শুকনো, তাজা খড় রয়েছে। বস্তা ভরা ভেড়ার খাবারদাবারও প্রচুর। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বেরিয়ে এলো রানা। ছড়ানো এক গাদা পাথর টপকে পাহাড়ের কিনারায় এসে দাঁড়ালো।

নিচে কুয়াশা ঢাকা উপত্যকা, প্রধান সড়কটা প্রায় পরিষ্কার দেখা গেল। রাস্তার আরো সামনে ঝিলমিল করছে পানি। সম্ভবত একটা লেক। ঘুরে দাঁড়ালো রানা, এবং প্রায় চমকে উঠে দেখলো। কাছেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা—রোয়েনা টুইড।

ম্লান, রুক্ষ প্রকৃতির সাথে মেয়েটার বিমর্ষ চেহারা মিলে গেছে। পুরনো একটা কালো কোট পরে আছে সে, কাঁধের কাছে প্যাড লাগানো। আজকাল আর এ-ধরনের কোটের চল্ নেই। গ্রাম্য কঠিন দু'গাল ঘিরে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে তালি দেয়া একটা স্কার্ফ।

'হ্যালো,' বললো রানা, ধীর পায়ে মেয়েটার দিকে এগোলো। 'সব সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে তো?'

রোয়েনার চেহারায় অদ্ভুত নির্লিপ্ত একটা ভাব, মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'প্রিস্ট মোটেও সময় নষ্ট করেনি। এই বৃষ্টির মধ্যে কে ভিজতে চায়।'

'তোমার বাবা কোথায়?'

'ডুগানকে নিয়ে পাশের গ্রামে গেছে। রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে গেছে আমাকে। তাড়াতাড়ি হবে বলে পাহাড়ী পথ ধরে চলে এলাম। ভেড়াগুলোকেও একবার দেখা হয়ে যাবে।'

'তুমিই বুঝি ওগুলো দেখাশোনা করো?'

'একরকম তাই। মেজাজ ভালো থাকলে ডুগান অবশ্য সাহায্য করে। মুশকিল হলো, নিজের শক্তি সম্পর্কে লোকটার কোনো ধারণা নেই। একটা ভেড়ার বাচ্চাকে হয়তো আদর করছে, পর মুহূর্তে দেখা গেল ঘাড় ভেঙে মরে আছে সেটা। ওর ওপর কোন ভরসা করা যায় না।' সরু পথ বেয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো রোয়েনা।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো রানা, তারপর বললো, 'তোমার মা মারা গেলেন—আমি দুঃখিত।' রোয়েনাকে অনুসরণ করলো ও।

'আমি নই,' নিষ্ঠুর শোনালেও, স্পষ্ট করে বললো রোয়েনা। 'এক বছর ধরে স্টমাক ক্যানসারে ভুগলো, অথচ হাসপাতালে যেতে রাজি হয়নি। আমাকেই দেখাশোনা করতে হতো। মানুষ মরে গেলে কি হয় আমি জানি না, তবে এখান থেকে চলে যেতে

পেরেছে বলে মার প্রতি আমার হিংসা হয়।'

'কেন, এই জায়গা তোমার ভালো লাগে না?'

চেহারায় অবাক ভাব নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রোয়েনা। 'এ-ধরনের একটা জায়গা কার পছন্দ হবে?' লম্বা করা একটা হাত একদিক থেকে আরেক দিকে নিয়ে গেল সে, রুক্ষ গোটা এলাকাটা দেখালো সে। 'এখানে এমনকি গাছগুলো পর্যন্ত অশুভ চেহারা নিয়ে বেড়ে ওঠে। প্রাণ কোথায় এখানে? এটা তো একটা বাতিল জগৎ। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এখানে শুধু ভেড়াগুলো বেঁচে আছে। সেটাও কোনো খুশি হয়ে ওঠার মতো ব্যাপার নয়। ভেড়াগুলো ডুগানের মতো—বোধবুদ্ধি নেই।'

'তাহলে তুমি অন্য কোথাও চলে যাও না কেন?'

'এতোদিন যেতে পারিনি মার জন্যে। এখন বোধহয় অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখানে থাকতে থাকতে ছিবড়ে হয়ে গেছি আমি। মনটা মরে গেছে। আর যাবোই বা কোথায়? কিছুই তো চিনি না।'

মেয়েটার চেহারায়, কণ্ঠস্বরে গভীর বেদনা ফুটে উঠলো। তার জন্যে আন্তরিক দুঃখ অনুভব করলো রানা। ইংল্যাণ্ডের মতো উন্নত, সভ্য একটা দেশেও কোনো মেয়ের এই করুণ অবস্থা হতে পারে বিশ্বাস করা যায় না। নিজের দেশের মেয়েদের কথা মনে পড়লো ওর। গোণা-গুণতি কিছু বাদ দিলে, মেয়েরা সবাই বন্দী-জীবন যাপন করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেল, নারী-নির্যাতনের অবসান আর হলো না। দেশ স্বাধীন হবার পরও মেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারছে

না। অদূর ভবিষ্যতে পারবেও না। যতদিন না দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে পুরুষের, ততদিন চলবে এই অবস্থা।

রোয়েনার দুঃখটুকু অনুভব করে একটু অস্থির হলো রানা। অনেকটা সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললো, 'তোমার মা চলে গেলেন, এখন হয়তো তোমার বাবা তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

হঠাৎ কর্কশ একটু শব্দ করে হেসে উঠলো রোয়েনা। 'ওই লোকের কথা আর বলবেন না। আমাকে নিয়ে তার একটাই ইচ্ছে···আমি শক্ত না হলে এতো দিনে সে—হুঁহ্,' আবার পথ চলতে শুরু করলো রোয়েনা। 'আমার তিন বছর বয়েসে বাবা মারা যান। মার মতো বাবাও ছিলেন জিপসি। দশ বছর আগে স্কিপটন মার্কেটে হোফার টুইডের সাথে পরিচয় হয় মার, এক হপ্তার মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। জীবনে এর চেয়ে বড় ভুল বোধহয় মা আর করেনি।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটাকে তুমি ঘৃণা করো।'

'এই জায়গাটাকেও—জীবনে একটাই চাওয়া আমার, এখান থেকে মুক্তি।'

'যদি সুযোগ হয়, কোথায় যেতে পারলে খুশি হও?'

হাঁটার গতি মুহূর্তের জন্যে শ্লথ হলো রোয়েনার। 'তা তো কখনো ভেবে দেখিনি। যে-কোনো শহর হলেই চলে, যেখানে ভালো একটা চাকরি পাবো, সুন্দর কাপড় পরতে পারবো, ভদ্র লোকজনের সাথে মেলামেশার সুযোগ আছে। লণ্ডন হলে মন্দ হয় না।'

বুঝতে অসুবিধে হয় না লণ্ডন রোয়েনার কাছে চাঁদের মতোই

দূরে, এবং সাংঘাতিক রোমান্টিক একটা জায়গা। 'নাগালের বাইরে অনেক জিনিসই লোভনীয় মনে হয়,' নরম সুরে বললো রানা। 'এমনও হতে পারে লণ্ডন তোমার কাছে এখানকার চেয়েও খারাপ লাগবে।'

'যদি লাগে, তাহলে আর কোথাও চলে যাবো,' বললো রোয়েনা। 'তবে এখানকার চেয়ে খারাপ লাগতেই পারে না। এটা তো স্রেফ একটা নরক। জানেন, কোথাও যাবার সুযোগ নেই বলেই হয়তো বেড়াবার ভারি শখ হয় আমার। সেজন্যে আপনার বন্ধুকে আমার ঈর্ষা হয়।'

থতমত খেয়ে গেল রানা। 'কার কথা বলছো!'

'জো সলোমন।'

'মানে?'

'আমি জানি, উনি ঘরকুনো নন,' বললো রোয়েনা। 'ইংল্যাণ্ডের প্রায় সব শহরে বেড়িয়েছেন উনি।'

'তুমি জানো?'

'হ্যাঁ।'

কোত্থেকে জানলো তা আর জিজ্ঞেস করলো না রানা, একটু পর নিজেই বলবে রোয়েনা। 'তাকে ঈর্ষা করার কারণটা ঠিক বুঝলাম না,' বললো ও। 'পাঁচ বছর জেল খেটেছে, ধরা পড়লে আরো পনেরো বছর—না, আরো কয়েক বছর বেশি খাটতে হবে। ধরা না পড়লেও যতো দিন বেঁচে থাকবে বেশিরভাগ সময় লুকিয়ে থাকতে হবে তাকে, বেড়াবার দিন শেষ।'

'আগের কথা ভেবেই বললাম,' রোয়েনার কণ্ঠস্বরে একটু যেন

অসহিষ্ণু ভাব। তারপর খুব উৎসাহের সাথে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, উনি স্মাগলার ছিলেন?'

'শুধু স্মাগলার কেন, আরো অনেক কিছু ছিলো সে।'

রানার বলার মধ্যে ব্যঙ্গ থাকলেও সেটা খেয়াল করলো না রোয়েনা। রানার মনে হলো, সলোমনের ব্যাপারে মেয়েটা একটু যেন বেশি উৎসাহী।

শুধু উৎসাহী নয়, রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লো রোয়েনা। হড়বড় করে বলতে শুরু করলো সে, 'গত বছর সানডেতে ওঁর সম্পর্কে একটা লেখা পড়েছিলাম। লেখাটায় ওঁকে আধুনিক রবিন হুড বলা হয়েছিল।'

'অনেক দৃষ্টিভঙ্গির একটা,' বললো রানা। 'সত্যি কিনা তা নির্ভর করে আসল রবিন হুড কি রকম ছিলো তার ওপর।'

'সত্যি নয় মানে?' মৃদু ঝাঁঝের সাথে প্রশ্ন করলো রোয়েনা। 'সানডে-তে এক বুড়ির সাক্ষাৎকারও ছাপা হয়েছিল। ভাড়া দিতে পারছিল না বলে বাড়িওয়ালা তাকে বের করে দিচ্ছিল ঘর থেকে, কথাটা কেউ মিঃ সলোমনের কানে তোলে। বুড়িকে তিনি তখুনি পাঁচশো পাউণ্ড পাঠিয়ে দেন। অথচ জীবনে বুড়িকে তিনি কখনো দেখেননি।'

রানা মেয়েটাকে বলতে পারে ঘটনাটা ঘটেছিল এসেক্সে ডাকাতি করার পর, সলোমনের হাতে তখন নগদ সত্তর হাজার পাউণ্ড রয়েছে। এই ডাকাতিতে দু'জন দারোয়ানকে আহত করে সে, একজনের খুলি ফেটে গিয়েছিল, আরেকজন একটা হাত হারায়। কিন্তু বলে কোনো লাভ নেই, অযথা সময় নষ্ট

করা হবে।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে রানা বললো, 'সন্দেহ নেই কিছু মহৎ গুণ তার আছে বটে।'

মাথা ঝাঁকালো রোয়েনা। ভারি খুশি হয়েছে কথাটা শুনে। 'আমি চাই উনি যেন নিরাপদে পালাতে পারেন। চোর হোক, ডাকাত হোক, অন্তরটা তো ভালো। আপনাদের দু'জনের জন্যেই প্রার্থনা করবো আমি।'

দুঃখী মেয়ে, তোর জন্যে কে প্রার্থনা করে।

'আমাদের মতো আরো লোক তোমাদের এখানে আসে, তাই না?' কাজের কথায় ফিরে এলো রানা।

'আসে। আপনাদের নিয়ে এ-বছরই তো দশ-বারো জন এসে গেল।'

'সলোমনের তিন বন্ধুও বোধহয় এসেছিল, তাই না?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হটন? নাকি ওদের কাউকে তুমি দেখোনি?'

সাথে সাথে আড়ষ্ট হয়ে গেল রোয়েনার শরীর। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে যখন তাকালো, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি, সমস্ত ভাব অদৃশ্য হয়েছে চেহারা থেকে। 'হ্যাঁ, ওরা এসেছিল।'

এবার রানার পেশীতে টান পড়লো। রিপ হটন অর্থাৎ বদরুল হাসানও এসেছিল? 'তিনজনই?'

মাথা ঝাঁকালো রোয়েনা।

'ক'দিন করে ছিলো ওরা?'

রোয়েনার চেহারায় কেমন যেন একটা চাপা বিচলিত ভাব।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললো সে, 'আমি জানি না। ওদের আমি যেতে দেখিনি।'

হঠাৎ রানার তলপেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। 'যেতে দেখোনি—সেটা কি অস্বাভাবিক?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, অস্বাভাবিক,' ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না রোয়েনা। 'আর সবাই দু'দিন কি তিন দিন করে থাকে, কাউকে কাউকে চলে যেতে দেখি। আমার সৎ বাবা ওদেরকে গাড়ি করে নিয়ে যায়।'

চলে যেতে দেখেনি মানে কি এখানেই কোথাও লাশ হয়ে আছে ওরা তিনজন? রানার মনের ভেতর ঝড় বইছে। হাসানের সুদর্শন, হাসি-খুশি চেহারাটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। তাহলে কি সে বেঁচে নেই?

'পরিষ্কার করে বলো আমাকে,' রানার গলায় আবেদনের সুর। 'জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হটনকে রাস্তা থেকে এখানে নিয়ে আসো তুমি, ঠিক যেমন আমাদেরকে নিয়ে এসেছো?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে নিয়ে আসার পর তাদের আর দেখোনি তুমি?'

'একটু ভুল হয়েছে,' বললো রোয়েনা। 'ওদের দু'জনকে তারপর আর দেখিনি। একজনকে দেখেছি—পরদিন আমার সৎ বাবা তাকে গাড়ি করে কোথায় যেন নিয়ে যায়।'

'কে সে?'

'রিপ হটন।'

তবে কি বেঁচে আছে হাসান?

বৃষ্টির মধ্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা। বাতাসের একটানা হাহাকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

'তোমার বাবা রিপ হটনকে নিয়ে যায়,' নিস্তব্ধতা ভাঙলো রানা। 'কোথায়, রোয়েনা?'

'আমি জানি না।'

'বাকি দু'জন? কোথায় তারা? কি ঘটেছে তাদের ভাগ্যে?'

'জানি না, সত্যি আমি জানি না।' হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠলো রোয়েনা।

'জানো না, নাকি জানতে চাও না?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো রোয়েনা, ঠাণ্ডায় হি হি করছে। তার একটা কনুই চেপে ধরলো রানা। 'ঠিক আছে, রোয়েনা, শান্ত হও। তোমার কোনো ভয় নেই।' সরু পথ বেয়ে নামতে শুরু করলো ও। খানিকটা নেমে এসে দাঁড়ালো আবার, ঘুরলো। 'তুমি নামছো না?'

'ভেড়াগুলোকে দেখতে হবে,' হাত দুটোকে শক্তভাবে এক করেও কাঁপুনি থামাতে পারছে না রোয়েনা। 'পরে—পরে আসছি আমি।'

তর্ক না করে হন হন করে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো রানা। দেখার প্রথম মুহূর্তেই হোফার টুইড আর তার কালো ছায়া ডুগানকে মূর্তিমান শয়তান বলে সন্দেহ করেছিল ও।

রোয়েনার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো। রাতে শোবার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করেছিল টুইড, ব্যাপারটা মনে পড়তেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।

পাথুরে পাঁচিলের কাছে সলোমনের সাথে দেখা হলো।

'কিছু পেলে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো সলোমন। 'একটা শটগান পর্যন্ত নেই। জানু গাটা কোথায় তা অবশ্য জানতে পেরেছি। এটা ওয়াইকেহেড ফার্ম, সেট্‌ল-এর কাছে।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে তাকালো সে। 'তোমাকে যেন উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার?'

'ভালো বুঝছি না,' বললো রানা। 'এইমাত্র কথা বললাম রোয়েনার সাথে। কেন যেন মনে হচ্ছে উডশেডে সাংঘাতিক কিছু একটা আছে।'

'আরে, কি হলো তোমার? প্রলাপ বকছো নাকি?'

'আলোচনার সময় নেই। রোয়েনাকে জন হেরিক আর রিড কোয়েনের কথা জিজ্ঞেস করো, নিজেই বুঝতে পারবে। চূড়া থেকে মেইন রোডটা পরিষ্কার দেখা যায়, টুইডের গাড়িটাকে আসতে দেখলেই ছুটে নেমে এসে আমাকে সাবধান করবে। ঠিক আছে?'

সলোমনকে ওখানে রেখেই বাড়ির দিকে ছুটলো রানা। বিস্ফারিত চোখে রানাকে কিছুক্ষণ দেখলো সলোমন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চূড়ার দিকে উঠতে শুরু করলো সে।

নেভীতে চাকরি করার সময় সাগরের সাথে প্রেম থাকলেও জো সলোমন আসলে শহুরে জীব। পাহাড় বেয়ে চূড়ায় ওঠার

সময় মাঝে মধ্যে থামলো সে, চারদিকের রুক্ষ প্রকৃতি তার মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়ে তুললো। অনেকটা যেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই শক্ত পাথরের ওপর জোরে জোরে পা ঠুকে এগোলো সে। তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার মতো কিছুই নেই চারপাশে। চূড়ায় উঠে ঘরটাকে পাশ কাটালো সে, কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো। রানা যেমন বলেছিল, রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। দিয়াশলাইয়ের বাক্সের মতো একটা সচল আকৃতি দৃষ্টি কেড়ে নিলো। একটা ট্রাক। কিন্তু টুইডের কালো কোর্ডের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও।

ঘুরে ঘরটার দিকে তাকালো সলোমন। সাথে সাথে রোয়েনাকে দেখতে পেলো। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুকে একটা শিশু ভেড়া, আদর করছে সেটাকে। চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিলো রোয়েনা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। দরজার কাছে পৌঁছে সলোমন দেখলো মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে একটা পাত্রে দুধের সাথে আর কি যেন মেশাচ্ছে রোয়েনা।

'এই মেয়ে,' ডাকলো সলোমন। 'তোমার বাবা এখনো ফিরলো না যে?'

'ডুগানকে নিয়ে পাশের গ্রামে গেছে। ভেড়াগুলোকে দুধ খাওয়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি আমি,' মুখ না তুলেই জবাব দিলো রোয়েনা।

একটা সিগারেট ধরালো সলোমন, আস্তে করে ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর। হঠাৎ সে তার বুকে অসহ্য একটা টান টান ভাব

অনুভব করলো, মনে হলো ধম বন্ধ হয়ে আসছে। গা থেকে কোটটা খুলে ফেলেছে রোয়েনা, পুরনো উলেন ড্রেসটা উরু পর্যন্ত নিতম্ব কামড়ে বসে আছে।

হঠাৎ চমকে দিয়ে গুরু গম্ভীর শব্দে মেঘ ডেকে উঠলো বাইরে। সেই সাথে বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। চট্ করে বাইরে তাকাবার ছলে সলোমনকে একবার দেখে নিলো রোয়েনা। ঘরের ভেতর গভীর ছায়া, কাল রাতের মতো আজ এই মুহূর্তেও সলোমনের চোখে রোয়েনার চেহারার কদর্য ভাবটুকু তেমন ধরা পড়লো না। কাপড়ের নিচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা স্তন, গুরু নিতম্ব, চওড়া পিঠ, পুরুষ্ট উরু, শুধু এই সবই দেখতে পেলো সে।

দাঁড়ালো রোয়েনা, দেয়ালের গায়ে একটা র‍্যাকের দিকে হাত বাড়ালো। সলোমনের গলা শুকিয়ে কাঠ। সিগারেট ফেলে দিলো সে। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এগোলো রোয়েনার দিকে। হাত দুটো দিয়ে তাকে ছুঁলো সে। নিজের দিকে টানলো।

রোয়েনাকে ঘোরালো সলোমন। কাঠের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলো রোয়েনা। চেহারায় কোনো ভাব নেই। সলোমনের বেয়াড়া আঙুলগুলো তার শরীরে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো, রোয়েনা বাধা দিলো না।

পাঁচ বছর কোনো মেয়ের গন্ধ পাইনি। সারা শরীরে তুমুল উত্তেজনা নিয়ে ভাবলো সলোমন। দীর্ঘ, কঠিন পাঁচটা বছর! হাতের কাছে এমন খাসা মাল পেয়ে কেন আমি নিজেকে বঞ্চিত করি, কোন্ অধিকারে? জন হেরিক আর রিড কোয়েনের কথা, রানার অদ্ভুত আচরণের কথা, সব ভুলে গেলো সে। কামনায়

অধীর হয়ে রোয়েনাকে নিজের বুকের ওপর টেনে আনলো। পিষতে লাগলো পাঁজরের সাথে।

ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠলো রোয়েনা। সেদিকে সলোমনের খেয়াল নেই। হিংস্র পশু যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। ফড় ফড় করে রোয়েনার কাপড় ছিঁড়ে ফেললো সে। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। শূন্যে তুলে নিয়ে ঝপাং করে ফেললো সে রোয়েনাকে খড়ের গাদায়। ভুলে গেল তার দায়িত্বের কথা।

নিচের উপত্যকায়, মেইন রোড থেকে বাঁক নিয়ে ফার্ম হাউসের মেটো পথে নেমে এলো হোফার টুইডের কালো ফোর্ড।

সলোমনের ঘোর কাটলো। ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে চিৎ হলো সে, ছাদের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন হাঁপাতে লাগলো। যা ঘটে গেল তার মধ্যে সূক্ষ্ম বা কোমল কোনো অনুভূতি ছিলো না, ছিলো পাশবিক উন্মত্ততা। তার পাশেই শুয়ে থাকলো রোয়েনা, চোখ জোড়া বন্ধ, তার নাকের নিচে ঠোঁটের ওপরটা ভেজা ভেজা। তার দিকে তাকিয়ে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো সলোমনের। মেয়েটা কুৎসিত, ধরে ফেলেছে সে। শুধু চেহারা নয়। নোংরা চুল, নোংরা মোজা, মুখের ভেতর পচা দুর্গন্ধ।

একটু সরে গেল সলোমন, সাথে সাথে চোখ মেললো রোয়েনা। জোর করে একটু হাসলো সলোমন। 'এই মেয়ে, ঠিক আছো তো?'

'জো, ওহ্ জো, তোমাকে আমি ভালোবাসি!' সলোমনের একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো রোয়েনা, মুখটা ঘুরিয়ে তার কাঁধে

ঠেকালো। পরমুহূর্তে আনন্দের আতিশয্যে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে।

এ এমন এক মেয়ের কান্না, জীবনে যে কখনো ভালোবাসা বা কোমল ব্যবহার পায়নি কারো কাছে। কেউ তাকে কাছে ডেকে আদর করেনি, দুটো সান্ত্বনার কথা শোনায়নি। কিন্তু রোয়েনার বোঝার মতো ধৈর্য, গরজ, সূক্ষ্ম বোধশক্তি সলোমনের নেই। রোয়েনার কাছে গোটা জগৎটাই মায়া, সেই মায়ার জগতে সলোমন একমাত্র বাস্তবতা হয়ে দেখা দিয়েছে, স্বভাবতই সলোমনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবে সে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রোয়েনার কাঁধ চাপড়ে দিলো সলোমন, তারপর উঠে পড়লো। ট্রাউজার পরে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো সে। কি প্রসঙ্গে কথা বলা যায় ভাবতে গিয়ে নাহিদের কথা মনে পড়লো। 'তোমার সাথে নাহিদের কিছু ঘটেছে নাকি? আসার সময় পথে দেখা হলো, মনে হলো খুব উত্তেজিত।'

খড়ের ওপর বসলো রোয়েনা। নোংরা হলেও ভরা যৌবন, চোখ ফেরাতে পারলো না সলোমন। তার শরীর আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছে অনুভব করে নিজেকে চোখ রাঙালো সে। কাপড়টা তুলে নিয়ে পরতে শুরু করলো রোয়েনা। 'বাপের কালেও এমন ভালোবাসার কথা শুনিনি,' কৃত্রিম অনুযোগের সুরে বললো সে। 'এটাই তোমার বৈশিষ্ট্য বুঝি? কাপড় না ছিঁড়ে ভালোবাসতে পারো না?'

মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলো সলোমন। কঠিন সুরে

বললো, 'তোমাকে না আমি একটা প্রশ্ন করলাম!'

ব্লাউজের পকেট থেকে ছোট্ট একটা চিরুণী বের করে মাথা আঁচড়াতে শুরু করলো রোয়েনা। 'উনি জানতে চাইছিলেন আরো লোকজন এখানে আসে কিনা।'

'জন হেরিক, রিড কোয়েন, আর রিপ হটন—এরা এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'নাহিদ আর কি জানতে চাইলো?'

'আমি ওদের চলে যেতে দেখেছি কিনা।'

সলোমনের ভুরু কুঁচকে উঠলো। 'দেখেছো?'

মাথা নাড়লো রোয়েনা। 'আসে তো অনেক লোক, তারা কেউ কেউ দু'তিন দিন থেকে আবার চলে যায়। কিন্তু তোমার দুই বন্ধুকে আমি যেতে দেখিনি।'

'দুই বন্ধু?'

'জন হেরিক, আর রিড কোয়েন।'

'ওদেরকে তুমি যেতে দেখোনি?' কথাটার তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করতে আরো দু'সেকেণ্ড সময় লাগলো সলোমনের। তারপরই তার চোখ জোড়া আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। ফিসফিস করে বললো সে, 'জেসাস ক্রাইস্ট!'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা শটগানের দুটো ব্যারেল পর পর বিস্ফারিত হলো। নিচের উপত্যকা থেকে, তুমুল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওপরে উঠে এলো আওয়াজটা।

দরজার দিকে ঘুরলো সলোমন। লাফ দিয়ে ছুটে এসে খপ্ করে তাকে ধরে ফেললো রোয়েনা। 'যেয়ো না, জো, যেয়ো না!

তোমাকে আমি ওখানে···।' আর্তস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠাস করে তার গালে চড় মারলো সলোমন। ছিটকে খড়ের গাদার ওপর পড়লো রোয়েনা। 'বেরো মাগী, ফাঁদ পেতেছিস। দাঁড়া আসছি!'

ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সলোমন। এক মুহূর্ত পাথরের মতো স্থির হয়ে থাকলো রোয়েনা, তারপরই চিৎকার করে উঠে সলোমনের পিছু পিছু ছুটলো সে।

দুই

পাহাড় থেকে ফার্মহাউসে নেমে এসে থমকে দাঁড়ালো রানা, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব, কি খুঁজছে তাও যেন ভালো করে জানে না। ওর সন্দেহ যদি সত্যি হয়, জন হেরিক আর রিউ কোয়েন যদি এখান থেকে কোথাও না গিয়ে থাকে, তাহলে এই বিশাল পাহাড়ী এলাকার যে-কোনো জায়গায় ওদের লাশ থাকতে পারে—কোথায় খুঁজবে সে? দুই পাহাড়ের মাঝখানে আছে খাদ, পাহাড়শ্রেণীর পিছনে রয়েছে বনভূমি আর জলা, খুঁজতে শুরু করলে পাঁচশো বছর লেগে যাবে কংকালগুলো পেতে।

ধীর পায়ে পাথুরে প্যাসেজে উঠে এলো রানা, এক মিনিট দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো কি করা যায়। অনুভব করলো, চারপাশ থেকে ওর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে গভীর নিস্তব্ধতা। ওর বাঁ দিকে একটা দরজা রয়েছে, ডান দিকে রয়েছে আরেকটা, ডাইনিং আর লিভিংরুমে যাওয়া যায়। প্যাসেজের শেষ মাথায়

রান্নাঘরের দরজা। হঠাৎ আরেকটা দরজা চোখে পড়লো, সিঁড়ি নিচে।

দরজাটা খুলতেই ভ্যাপসা একটা গন্ধ ধাক্কা দিলো নাকে। ভেতর দিকের দেয়াল হাতড়ে আলোর সুইচটা অন করলো রানা। একটা পাথুরে সিঁড়ি, প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে নিচের দিকে। ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করে নিজেকে ধমক দিলো ও, এতো ভয় পাবার কি আছে? ভূত বিশ্বাস করি না। খুব বেশি হলে দু'একটা সাপ, আর এক-আধটা কংকাল দেখতে পাবো।

সিঁড়ির নিচে সরু, সাদা চুনকাম করা একটা প্যাসেজ। বাঁক নিয়ে আরেক প্যাসেজে চলে এলো রানা। দু'ধারেই সার সার স্টোররুম, বাতিল জিনিস-পত্র আর আবর্জনায় ঠাসা। প্যাসেজের শেষ মাথায় পৌঁছে হতাশ হলো রানা, পাতালপুরিতে আবিষ্কার করার মতো কিছু আছে বলে মনে হলো না। ঘরগুলোয় উঁকি দিয়ে দেখেছে, একটা হাড় পর্যন্ত চোখে পড়েনি। মেঝেগুলো মসৃণ।

প্রথম প্যাসেজে ফিরে এলো রানা। সিঁড়ির দিকে এগোলো।

'হাওয়া খাওয়া হচ্ছে বুঝি?' সিঁড়ির মাথা থেকে ব্যঙ্গ করলো হোফার টুইড। 'কিন্তু এ-জায়গাটা যে বড় দুর্গন্ধ!' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে, বগলের তলায় একটা ডাবল ব্যারেল শটগান।

সিঁড়ির গোড়ায় একবার শুধু একটু শ্লথ হলো রানার গতি, ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলো ও। 'হাওয়া খাচ্ছি না, বেড়াচ্ছি,' বললো ও। 'দুর্গন্ধের জন্যে এখানে যারা বাস করে তারা

দাঁড়ি।'

পিছু হটে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল টুইড, চোখ-মুখ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত। 'মিঃ জো সলোমনকে কোথাও দেখছি না। সে?'

'আছে কোথাও আশপাশে।'

'আর রোয়েনা, আমার ছুছুন্দরী কন্যা?' জিভ আর টাকরা সহযোগে অশ্লীল একটা শব্দ করলো টুইড। 'হিশাবে বলে, ওরা একসাথে আছে, তাই না, মিঃ নাহিদ শাহ?' কনুই দিয়ে রানার পাঁজরে মৃদু একটা গুঁতো মারলো সে।

'থাকলেও আমি জানি না।'

লোকটা সারাক্ষণ হাসছে বটে, কিন্তু পরিবেশটা উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে। বিপদের মধ্যে রয়েছে রানা, যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তৈরি হয়ে আছে ও, যাই ঘটুক, সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। অস্পষ্টভাবে অনুভব করলো হাতের সেলাইগুলোর কাছে চিনচিনে একটা ব্যথা। যতোই তৈরি থাক ও, বিপদের সময় হয়তো মাত্র একটা হাত ব্যবহার করতে পারবে।

আরো এক পা পিছিয়ে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলো হোফার টুইড। 'পেছন দিকে, বুঝলেন,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে আছে সে, যেন কি এক গোপন পুলক চেপে রাখতে পারছে না, 'মজার একটা জিনিস আছে। সবাইকে দেখাই না। কেউ নেই, আমরা একা, এখনই সুযোগ। আসুন।'

ঘুরলো সে, বেশ কিছুটা আগে আগে হাঁটতে শুরু করলো।

প্যাসেজ, তারপর রান্নাঘর হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। উঠনের এক ধারে থামলো টুইড, ছোটো একটা গেট খুলে ক্ষুদে আরেকটা উঠনে ঢুকলো। তার পিছু নিলো রানা।

প্রায় ফাঁকা উঠন, মাঝখানে শুধু একটা ঢাকনি লাগানো পুরনো কুপ, গোল করে ঘিরে আছে নিচু পাঁচিল। পাশেই দাঁড়িয়ে গরিলাসদৃশ ডুগান, কদর্য চেহারায় স্থির হয়ে আছে অশ্লীল হাসি, ঠোঁটের কোণ থেকে মোটা সুতোর মতো লালা ঝরছে। হাত দুটো একটু বাঁকা করে সামনে বাড়ানো, ভাবটা যেন কিছু ধরবে বলে অপেক্ষা করছে।

'আমাদের ডুগানের একটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনাকে বলেছি, মিঃ নাহিদ শাহ?' খিক খিক করে হাসলো টুইড। 'নারকেল ভাঙার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। তবে মুশকিল হলো, মানুষের মাথাকেও নারকেল বলে গণ্য করে ও।'

'তাই নাকি?' ডুগানের দিকে কঠিন চোখে তাকালো রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে, গেটের দিকে তাকালো ডুগান। লক্ষ্য করে আবার খিকখিক করে হাসলো টুইড। 'কোনো চিন্তা নেই, ডুগান, তোমার কাজ তুমি নিরাপদে সারতে পারবে। মিঃ সলোমনের কথা ভাবছো তো? তিনি লোভে পড়ে গেছেন, নারী-মাংস ফেলে আসতে পারবেন না।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'বিরোধী পক্ষকে দু'ভাগ করার জন্যে এই নারী মাংসের কোনো তুলনা হয় না, বুঝলেন। আমার রোয়েনা পটে আঁকা ছবি তা বলছি না, কিন্তু ওর শরীরে যেখানে যা থাকা দরকার সব আছে, একটু বরং বেশি বেশিই আছে। তাছাড়া, একটা কথা তো সত্যি,

আপনার বন্ধু টানা পাঁচ বছর ধরে উপোস আছেন। দেখতে হয়তো ভালো নয়, কিন্তু জিনিস যে খাসা তা তাকে স্বীকার করতেই হবে।' বিরতি নিলো সে, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাঁক ছাড়লো, 'তৈরি হও, ডুগান! সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না!'

শটগানের ব্যারেলটা রানার পিঠ ছুঁলো, একই সাথে উঠনের ওপর ঝনাৎ করে আছড়ে পড়লো কুয়ার ঢাকনি। পিঠে শটগানের স্পর্শ পেতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। ঘুরলো ও, ব্যারেল ঢুকলো বগলের তলায়। ডান হাতের কিনারা দিয়ে টুইডের কানের নিচে, ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো রানা। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠলো টুইড, এলোমেলো পা ফেলে পিছিয়ে গেল। ডান হাতের হ্যাঁচকা টানে শটগানটা কেড়ে নিলো রানা। আঙুলের সাহায্যে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হ্যামার তুললো। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে ছুটে এলো ডুগান, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। পিছন ফিরে সময় নষ্ট করলো না, সামনের দিকে ছুটলো। জানোয়ারটাকে বাধা দিতে হলে দু'জনের মাঝখানে খানিকটা ফাঁক দরকার।

গেটের দিকে ছুটতে শুরু করে একবার শুধু আড়চোখে ডুগানকে দেখে নিলো রানা। যেন প্রাগৈতিহাসিক কোনো জন্তু ধাওয়া করে আসছে, ঘৃণ্য চেহারা আক্রোশে বিকৃত, ছিঁড়ে আর ফেড়ে ফেলার জন্যে বিশাল দুই হাত লম্বা করে দিয়েছে। রানা তাকে এমন কি কাছে পর্যন্ত ঘেঁষতে দিলো না। জানে, অসুরটার সাথে গায়ের জোরে পারবে না সে। বগলের নিচে শটগান চেপে সবেগে

আধপাক ঘুরলো, বাঁ হাতের ওপর লম্বা হয়ে থাকলো ব্যারেল, বিকট শব্দের সাথে পর পর দুটো বুলেট বেরিয়ে গেল। প্রথম গুলিটা ডুগানের বুকে লাগলো, প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিলো পথের ওপর। দ্বিতীয় গুলি খসিয়ে দিলো মুখের অর্ধেকটা। পাথুরে মেঝেতে ছিটকে পড়লো মগজ, হাড়, আর রক্ত।

আশ্চর্য! তারপরও আছাড় খেলো না ডুগান। পিছু হটে নিচু পাঁচিলের গায়ে পড়লো সে, ধপ্ করে বসে পড়লো পাঁচিলের মাথায়। তারপর পিছন দিকে ঢলে পড়তে শুরু করলো শরীরটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গিয়ে বুকে ঠেকলো। পিছন দিকে ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিতে কুয়ার ভেতর নেমে গেল সে। কোনো শব্দ হলো না। কুয়ার নিচে থেকে একটা আওয়াজ উঠে এলো, মাত্র একবার ছলকে উঠলো পানি।

আবর্জনায় মুখ দিয়ে উপুড় হয়ে আছে হোফার টুইড, দেহটা মোচড় খাচ্ছে। গোঁ গোঁ করে গোঙাচ্ছে এখনো। একটা হাঁটু ভাঁজ করে তার পাশে নিচু হলো রানা, পকেট হাতড়ে এক মুঠো কার্ট্রিজ বের করলো। শটগান রি-লোড করে সিধে হলো ও, ঝেড়ে একটা লাথি মারলো টুইডের পাঁজরে। 'দাঁড়াও।'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো টুইড, পিছু হটে উঠনের পাঁচিলের দিকে সরে গেল। তার সাথে সাথে এগোলো রানা, লোকটার চিবুকের নিচে শটগানের মাজ্‌ল্ ঠেকালো।

'জন হেরিক আর রিড কোয়েন, দু'জনেই ওই কুয়ার ভেতর আছে, তাই না?' টুইড ইতস্তত করছে দেখে শটগান ধরা ডান হাতটা ঝাঁকালো রানা, চিবুকের নিচে নরম মাংসে ব্যথা পেয়ে

ককিয়ে উঠলো টুইড। 'কি, সত্যি ?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো টুইড। 'সত্যি—হ্যাঁ, সত্যি।'

'মোট ক'জন ?' লোকটা আবার ইতস্তত করছে দেখে হ্যামার কক্ করলো রানা।

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো টুইড। 'মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে মেরো না!' অবোধ শিশুর মতো ফোঁপাতে লাগলো সে। 'বেশি না, মাত্র চারজন!'

'বেশি না!' দাঁতে দাঁত ঘষলো রানা, ট্রিগার টেনে দেয়ার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে দমন করলো। 'বাকি লোকরা নিরাপদে চলে যেতে পেরেছে ?'

'হ্যাঁ। আমার কোনো দোষ নেই, আমি শুধু হুকুম পালন করেছি।'

'তা বটে, তোমার আর কি দোষ! বাকি লোকগুলো এরপর কোথায় যায় ?'

'আমি জানি না।' শটগানের ব্যারেল আবার ঝাঁকি খেলো, আতংকে চেঁচিয়ে উঠলো টুইড, 'ফর গডস সেক, সত্যি কথা বলছি—আমি জানি না। এখান থেকে দশ মাইল দূরে রাস্তার মোড়ে ওদের আমি নামিয়ে দিয়ে আসি। সেখান থেকে অন্য আরেক লোক ওদেরকে তুলে নিয়ে যায়।'

ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। বাড়ির ভেতর থেকে সলোমনের চিৎকার ভেসে এলো, 'নাহিদ—কোথায় তুমি ?'

'বাইরে!' জবাব দিলো রানা।

এক মুহূর্ত পর গেটের বাইরে দেখা গেল সলোমনকে। 'কি,

ঘটছে কি এখানে ?'

'ওরা বলছিল কুয়ার ভেতর আমি নাকি খুব আরামে থাকবো, কথাটা সত্যি কিনা দেখার জন্যে ডুগানকে পাঠিয়েছি। নিচে তাকে জন হেরিক আর রিড কোয়েন অভ্যর্থনা জানাবে।'

টুইডের দিকে এগোলো সলোমন। 'শালা বানচোত !'

উঠনের মেঝেতে ঘষা খেয়ে পিছু হটার চেষ্টা করলো টুইড। 'আমাকে বাঁচাও, মিঃ নাহিদ ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও !' তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

সলোমনের চেহারায় নগ্ন উল্লাস। 'আরে, ভয় পাও কেন !' হাসছে সে। 'তোমাকে তো আমি আদর করবো।' হাঁটু গেড়ে টুইডের পাশে বসলো সে। একটা পা তুলে তার ডান কনুইয়ের ওপর রাখলো, নিশ্চল হয়ে গেল হাতটা। মুঠোর ভেতর তার একটা আঙুল ভরলো সলোমন, তারপর জোরালো এক চাপ দিয়ে আঙুলটা হাতের উল্টোপিঠে ঠেকালো। ছোট্ট একটা মৃদু শব্দ হলো মট্ করে।

ছটফট করতে লাগলো টুইড। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল চেহারা। তার পকেট হাতড়ে যা যা পেলো সব বের করে এদিক ওদিক ছুঁড়ে দিলো সলোমন। শুধু মানিব্যাগটা ফেললো না। খুলে দেখলো ভেতরে ষাট পাউণ্ডের মতো নোট রয়েছে। টাকাগুলো পকেট ভরে মাথা ঝাঁকালো সে। 'কাজে লাগবে। কি বললো বানচোতটা ?'

'সবাইকে কুয়ায় ফেলা হয়নি। বেশিরভাগ মক্কেলকে বহাল তবিয়তে চলে যেতে দেয়া হয়েছে।'

'কোথায় ?'

'জানে না। দশ মাইল দূরে রাস্তার এক মোড়ে নাকি নামিয়ে দিয়ে আসে। আরেক লোক এসে তুলে নেয় তাদের।'

টুইডের দিকে ফিরে আবার নরম শব্দে হাসলো সলোমন। 'শালা ফাদার-ইন-ল, ভেবেছো ছেলে-ভুলানো কথা বিশ্বাস করবো ? জানো না, না ? কে ওদের তুলে নিয়ে গেল, আড়াল থেকে দেখোনি তুমি ? পিছু নাওনি ? মিথ্যে কথা বললে তোর আমি শালা সব ক'টা আঙুল···।'

রানার দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো টুইড। 'মেরে ফেলবে, ও আমাকে মেরে ফেলবে!'

'আমারও তাই ধারণা,' রানা নির্লিপ্ত। 'তোমার জায়গায় আমি হলে গড় গড় করে বলে ফেলতাম সব।'

হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা ঝাঁকালো টুইড। তার চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ঠোঁটের কোণে আর চিবুক থেকে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রক্ত মুছলো সে। 'ঠিক আছে, বলছি। মকেল-দের আমি দু'বার অনুসরণ করি।'

'কি ঘটলো ?'

'একটা ফার্নিচার ভ্যান এসে তুলে নেয় ওদের, শ্রুজবারি-র বাইরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেয়।'

'তারপর ?'

'রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে থাকে ওরা, প্রতিবার একজনই ওদের নিতে আসে—অন্ধ একটা মেয়েলোক, সাথে গাইড কুকুর থাকে। তার নাম ব্রানশি—রুথ ব্র্যানশি।

আলমা কটেজে থাকে সে, বাম্পটনে। মেয়েলোকটা আত্মা ডাকতে পারে, ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, আরো কি যেন সব…।'

দম ফুরিয়ে গেছে, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, ছুটতে ছুটতে গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো রোয়েনা, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো সে। 'জো, জো তুমি…তোমাকে ওরা…!'

ঘুরলো সলোমন, মেয়েটার দিকে এগোলো। 'বাহ্, বাপ-বেটিতে জোড়া মিলেছিস ভালো। মেয়ে একজনকে আটকে রাখলো, বাপ আরেকজনকে কুয়ায় ফেলতে গেল। আমাকে ছিবড়ে বানিয়ে, তারপর বাপকে গিয়ে ধরতিস, এবার ওকে ফেলে দাও কুয়ায়—তাই না? বেশ্যা, খানকি, ছিনাল। এরকম ক'জনকে খুন করেছিল, বল্?'

সলোমনের অস্থির মাথা আর চোখ জোড়াকে রোয়েনার উদভ্রান্ত দৃষ্টি সারাক্ষণ অনুসরণ করছে। তার দু'গাল বেয়ে অঝোরে পানি ঝরছে। নিঃশব্দে মাথা নাড়লো সে, ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। সলোমনের বুকে হাত তুলে নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করলো। 'আমি জানতাম না, জো। বিশ্বাস করো আমি জানতাম না…।'

খপ্ করে রোয়েনার চুলের গোছা ধরে ফেললো সলোমন, মাথাটা পিছন দিকে নোয়ালো। 'কি ভেবেছিস আমাকে, কচি খোকা?'

লম্বা তিনটে পা ফেলে কাছে চলে এলো রানা। 'ছাড়ো ওকে,' সলোমনকে ধমক দিলো। 'আসলে সত্যিই কিছু জানে না ও। সন্দেহ করতো, আর সে-কথা আমাকে বলাতেই এ-যাত্রা বেঁচে গেছি।'

ওদের পিছনে সুযোগটা কাজে লাগালো টুইড। পাঁচিলটা এক জায়গায় ভাঙা, ফাঁকটার দিকে ধীরে ধীরে এগোলো সে। কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ দৌড় দিলো। হুংকার ছাড়লো সলোমন, পিছু নিলো, কিন্তু খানিক পর ফিরে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। হোফার টুইডকে ধরতে পারেনি সে।

রানার মনে হলো সলোমনের বদলে সে গেলেই ভালো করতো।

বড় উঠনটায় ফিরে এলো ওরা, সলোমনের শার্টের আস্তিন ধরে প্রায় ঝুলে পড়লো রোয়েনা। 'আমাকে তোমার সাথে নেবে, জো?'

'খুশি হই যদি আমাকে ঘেন্না করো।' বলে সজোরে রোয়েনাকে ধাক্কা দিলো সলোমন।

মাটিতে পড়ে গেল রোয়েনা, ব্যথাও পেলো, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করলো না। প্রায় সাথে সাথে দাঁড়ালো সে, আবার খামচে ধরলো সলোমনের কনুইয়ের ওপরটা। 'কিন্তু আমাকে ফেলে তুমি যাও কিভাবে!' তার চেহারায় আবেদন: 'কি ঘটে গেছে তুমি জানো!'

'মানে? কি বলছে ও?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'কি বলছে আমি কি জানি?' অধৈর্য হয়ে উঠলো সলোমন। 'বাড়ি থেকে কিছু খাবার আনি, তারপর আমরা চলে যাবো। বোধহয় ফোর্ডটা নিয়ে গেলেই ভালো হবে।'

'প্লিজ, জো!' সলোমনের পথ আটকালো রোয়েনা।

প্রচণ্ড রাগে হাঁটু ভাঁজ করলো সলোমন, রোয়েনাকে লাথি

মারবে। চোখে করুণ ভাব আর অবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে মেয়েটা, আত্মরক্ষার কথা একবারও ভাবলো না। হিংস্র আক্রোশে শে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে সলোমনের। লাথিটা ছুঁড়লো সে, সেই সাথে নিতম্বে প্রচণ্ড একটা লাথি খেলো। ছিটকে পড়লো সে, খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলে পতনটা ঠেকালো রানা।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছে সলোমন। রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো সে। 'তুমি আমাকে মারলে!'

সলোমনের দিকে নয়, ভুরু কুঁচকে রোয়েনার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে মেয়েটা। ওকে দেখে যে-কোনো মানুষের মায়া হবে। মা মারা যাবার পর অভাগিনী একা আর অসহায় হয়ে পড়েছে। দেখতে কুৎসিত, কেউ ওকে ভালোবাসবে না। অন্তত এখানে, এই পাহাড়ী এলাকায় ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এখানে থাকলে কি পরিণতি হবে জানা কথা। আবার ফিরে আসবে টুইঙ, অন্তত শুধু রোয়েনার জন্যে হলেও ফিরে আসবে। বুড়ো লম্পটের ভোগের সামগ্রী হবে কচি মেয়েটা। সময় নষ্ট হচ্ছে বলে নিজের ওপর বিরক্ত হলো রানা, কিন্তু মেয়েটার কথা মন থেকে তাড়াতে পারলো না। মানবিক একটা সমস্যা, ওর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওকে সাথে নিলেও ঝামেলা। একটা বোঝা তো নয়। কে ওর দায়িত্ব নেবে?

এগিয়ে গিয়ে রোয়েনার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। ছুঁতে যা দেরি, রানাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো

মেয়েটা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, 'আপনার বন্ধুকে বোঝান, প্লিজ! ওর সাথে আমার···প্লিজ! আপনি আমার ধর্ম-ভাই, আপনার দুটো পায়ে পড়ি···।'

একটা ঝাঁকি দিলো রানা। 'তুমি গাড়ি চালাতে জানো?'

কান্না ভুলে ঝট্ করে মুখ তুললো রোয়েনা। 'পারি। খুব ভালো পারি।'

'তারমানে?' খেঁকিয়ে উঠলো সলোমন। 'তোমার মতলবটা কি?'

'চিন্তার ব্যাপার আছে এখানে,' বললো রানা। 'পথে কোথাও যদি রোড-ব্লকের সামনে পড়ি আমরা? সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কোর্ড নিয়ে এক মাইল সামনে থাকতে পারে রোয়েনা, পিছনে আমরা ক্যাটল ট্রাকে থাকলাম, রোড-ব্লক দেখতে পেলে ফিরে এসে ও আমাদেরকে সাবধান করতে পারবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো সলোমন, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নিচু করলো। 'সেটা একটা কথা বটে! নাহ্, তোমার বুদ্ধি আছে।' রোয়েনার দিকে ফিরলো সে, নির্লজ্জের মতো হাসলো। 'কি বলেছি ভুলে যাও, ডার্লিং। কিন্তু বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারবে তো?'

বিজয় আর সাফল্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রোয়েনার চেহারা। 'তোমার জন্যে সব পারবো আমি, জো। একটা সুযোগ দিয়ে দেখো না!' রানার দিকে ফিরলো সে। 'আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

একটু আড়ষ্টবোধ করলো রানা। এ-ধরনের সরল প্রশংসা বা স্বীকারোক্তি শুনতে অভ্যস্ত নয় ও।

পাহাড়ী পথ ধরে ট্রাকটা অদৃশ্য হতেই উদয় হলো হোফার টুইড। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পিছন দিক দিয়ে ফার্মহাউসে ঢুকলো সে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠনে এসে দাঁড়ালো, আঙুল ভাঙা হাতটা শরীরের পাশে মরা সাপের মতো ঝুলে আছে। নাকে-মুখে রক্ত, বুকে আর পাঁজরে ব্যথা, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ভাঙা আঙুল, যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখছে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে রান্নাঘরে ঢুকলো, সিঙ্কের ওপর মাথা নিচু করে পানির ট্যাপ ছাড়লো। তারপর যখন সিধে হয়ে তোয়ালের দিকে হাত বাড়াতে যাবে, দেখলো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট পিয়ারসন। 'হ্যালো, মি. জনি,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বললো সে, 'আপনি আসবেন আমি আশা করিনি।'

'ভাবলাম একবার টু মেরে দেখে যাই সব ঠিকঠাক মতো শেষ হলো কিনা,' পিয়ারসন ওরফে জনি বললো। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, তুমি কোন্ যুদ্ধ থেকে ফিরলে? তৃতীয়?'

জোর করে হাসলো টুইড। 'হ্যাঁ, একটু ঝামেলা হয়েছিল।' তার মাথা বিদ্যুৎ বেগে কাজ করছে। 'তবে গোটা ব্যাপারটারই সুন্দর বিহিত করা গেছে। আপনি আমার টাকা এনেছেন তো?'

'বুড়ো খোকা, এরই মধ্যে ওদের তুমি বিদায় করেছ?'

জিজ্ঞেস করলো জনি। 'বলতেই হয়, এক্সপার্ট লোক তুমি। তা, বেঁধেছো তারা?'

'কেন, পিছনের কুয়ায়।'

'একবার দেখতে চাইলে কিছু মনে করবে?'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো টুইড। 'কিছু দেখতে পাবেন বলে মনে হয় না। তবু যখন বলছেন···।' কাঁধ ঝাঁকালো সে। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, লোকটাকে দেখার পর থেকে পায়ে, হাতে, বুকে, পাজরে, কোথাও কোনো ব্যথা অনুভব করছে না সে। শুধু হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে—ভয়ে।

ছোটো উঠনে ঢুকলো ওরা, এখনো ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। কুয়ার সামনে দাঁড়াতেই দুর্গন্ধে বমি পেলো জনির। রুমালে নাক-মুখ চেপে কুয়ার ভেতর উঁকি দিলো সে। এতো গভীর, নিচ পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। 'তাহলে ওদের তুমি এটার ভেতর ফেলেছো, কেমন, বুড়ো খোকা?'

'হ্যাঁ, স্যী,' সবিনয়ে বললো টুইড।

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জনি। 'আচ্ছা, তুমি তো জানো, তুমি একটা জঘন্য টাইপের মিথ্যুক—সেজন্যে তোমার নিজের ওপর ঘেন্না হয় না?'

চোখ জোড়া বিস্ফারিত করে টুইড কিছু বলতে গেল, একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো জনি। প্রথম থেকেই মিটিমিটি হাসছে সে, চোখ বাদে হাসিটা এখন সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। 'হেঁটে পাহাড় টপকে এখানে এলাম, বুড়ো খোকা,' বললো সে। 'নাহিদ শাহ আর জো সলোমনকে দেখলাম

তোমার ট্রাক নিয়ে পালাচ্ছে।'

কথাটা সত্যি, মিথ্যে বলছে না জনি। কিন্তু মিনিট কয়েকের জন্যে তার চোখে ফোর্ড গাড়িটা ধরা পড়েনি।

'তোমার না একটা মেয়ে আছে? সে কোথায়?'

ফিসফিস করে টুইড বললো, 'ঠিক জানি না। বোধহয় ভেগেছে।'

'তাই? বেশ, বেশ। তোমার হাত দেখছি খুব পিছলা, কাউকেই ধরে রাখতে পারো না,' ঠোঁট টিপে হাসলো জনি। 'বউ, মেয়ে, একজোড়া শিকার, সব হারিয়ে ফেললে। তা, রুথ ব্ল্যানশির কথা বলেছো ওদের? বলেছো, আলমা কটেজে থাকে সে, বাম্পটনে?' টুইডের চেহারা দেখেই উত্তর পেয়ে গেল জনি। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো সে। 'কাজটা বোকার মতো হয়ে গেল না, বুড়ো গোকা?' তার পকেট থেকে বেরিয়ে এলো স্প্রিংটা, ভোরের আলোয় ঝিক্ করে উঠলো ছুরির ফলা। ডগাটা টুইডের চিবুকের পাশে নরম মাংস স্পর্শ করলো, তারপর চোখের পলকে জিভ ভেদ করে ঢুকে গেল মগজে।

সাথে সাথে মারা গেল টুইড। এক হাতে তাকে খাড়া করে রেখে, টান দিয়ে ছুরিটা বের করলো জনি, ফলাটা টুইডের জ্যাকেটে ঘষে ঘষে মুছলো। তারপর ধাক্কা দিতেই পাঁচিলের মাথায় পড়লো লাশ, পিছন দিকে ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়ার ভেতর। ঘুরে হাঁটা ধরলো জনি, ভিজে চুল সরালো কপাল থেকে, আপনমনে হাসছে মিটিমিটি।

তিন

সবুজ একটা ট্রায়াম্প স্পিটফায়ার চালাচ্ছে জনি। ষাট মাইল স্পীড। পনেরো মাইল পেরিয়ে এসে ট্রাকটাকে দেখতে পেলো সে, আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটালো সেটাকে। আরো এক মাইল সামনে কালো ফোর্ড গাড়িটাও তার চোখে পড়লো, ড্রাইভিং সীটে বসে আছে রোয়েনা। কিছুই ভাবলো না জনি। টুইডের মেয়েকে কখনো দেখেনি সে, তাছাড়া, পলাতক মক্কেলদের সাথে মেয়েটার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করারও কোনো কারণ নেই তার।

ব্ল্যাকবার্ণ পেরিয়ে এসে, রাস্তার ধারের একটা কাফের সামনে থামলো জনি। সোজা টেলিফোন বক্সে ঢুকে লণ্ডনের ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট-এর নাম্বারে ডায়াল করলো।

'হ্যালো, সুইটি। ভাবলাম তোমাকে জানানো দরকার কি ঘটেছে।'

'কি ঘটেছে?'

'আর বলো না। আমাদের বন্ধু টুইস্ট নাচতে গিয়েছিল,

আছাড় খেয়েছে।'

'আই সি।'

'প্যাকেট দুটো···।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ?'

'ওগুলো বাম্পটনে পৌঁছুবে।'

'খারাপ কথা। কি করবে বলে ভাবছো?'

'আগে শোনো কি করেছি,' বললো জনি। 'তারপর শোনো কি করবো। এখানকার শাখাটা বন্ধ করে দিয়েছি, বুঝলে? মহামান্য তো সেরকম নির্দেশই দিয়েছিলেন—কেউ ভুল করলে তার সাথে হিশেব চুকিয়ে ফেলো। প্যাকেট দুটো বাম্পটনে পৌঁছুবার আগেই ওখানে আমি পৌঁছে যাবো। ওগুলো রিসিভ করার জন্যে আমার ওখানে থাকা দরকার।'

অপরপ্রান্তের মার্জিত নারী-কণ্ঠ থেকে উত্তর এলো, 'আই, ডিয়াটা আমার পছন্দ হলো না। আমি বরং তাঁর সাথে পরামর্শ করি। তোমার নম্বরটা দাও, পনেরো মিনিটের মধ্যে রিং করবো।'

ফোন বক্স থেকে বেরিয়ে এসে কাউন্টারের সামনে, একটা টুলে বসে ফফির অর্ডার দিলো জনি। যুবতী ওয়েট্রেস কফি দিয়ে যাবার সময় সুদর্শন খদ্দেরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। সুদর্শন এবং সুবেশী জনিকে মেয়েরা দেখলেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে জনি অন্য এক জগতে রয়েছে। মেয়েটা অনুভব করলো, তার শরীর ভেদ করে যুবকের দৃষ্টি বহুদূরে স্থির হয়ে আছে। খানিকটা হতাশ হয়েই নিজের কাজে

ফিরে গেল সে।

কাউন্টারের পিছনের দেয়ালে একটা আয়না, সেদিকে চোখ রেখে সিগারেট ধরালো জনি, কুঁচকে আছে ভুরু জোড়া। ফার্ম-হাউসের ঘটনা ভুলে গেছে সে, অতীত তার কাছে গুরুত্বহীন। ভাবছে নিকট ভবিষ্যতের কথা। মহামান্য কাউন্ট কি তাকে সুযোগটা দেবেন? হাত দুটো নিশপিশ করে উঠলো তার। দু'চোখে অদ্ভুত এক তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি। কাউন্ট যদি অনুমতি দেন তাহলে জীবনে এই প্রথম একসাথে দু'জনকে খুন করার সুযোগ পাবে সে। দীর্ঘ তালিকায় আরো দুটো নাম যোগ হবে—নাহিদ শাহ, জো সলোমন।

জনি ওরফে রবার্ট পিয়ারসনের বয়স বত্রিশ। তার আট মাস বয়সে বাবাকে ছেড়ে আরেক লোকের সাথে চলে যায় মা। বাবা ছিলেন আর্মি কর্নেল, জনির পাঁচ বছর বয়সে আবার তিনি বিয়ে করেন। জনির এক ভাই হয়, তিন বছর বয়সে এক রহস্যময় দুর্ঘটনায় মারা যায় বাচ্চাটা। দু'ভাই একই ঘরে ঘুমাতো, এক-দিন সকালে উঠে দেখা গেল ছোটো ভাই বিছানায় মরে পড়ে আছে। কর্নেল তার ছোটো ছেলের গলায় কালচে দাগ দেখে-ছিলেন, কিন্তু কথাটা তিনি কাউকে বলেননি। এগারো বছরের জনিকে তিনি ভালো বুঝতে পারতেন না, কিন্তু সৎ মায়ের দিকে ছেলের তাকানোর ভঙ্গিটা তার ভালো লাগতো না। জনি হাসি-খুশি, কেউ তাকে কখনো মনমরা হয়ে থাকতে দেখেনি, কাঁদতেও দেখেনি। কর্নেলের মনে হতো, ছেলেটার মধ্যে আবেগ বা বেদনাবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বাপ বলেই তিনি

লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন, ছেলেটা হাসি-খুশি হলেও, তার হাসি কখনোই চোখ স্পর্শ করে না।

সাত-পাঁচ ভেবে জনিকে তিনি বাড়িতে রাখলেন না, ভর্তি করে দিলেন বোর্ডিং স্কুলে। তারপর থেকে এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে, পেয়িং গেস্ট হিসেবে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে, দেশ-বিদেশে এক আর্মি স্টেশন থেকে আরেক আর্মি স্টেশনে অল্প কিছুদিন করে সময় কেটেছে জনির। কোথাও সে বেশিদিন একটানা থাকতে পারেনি। কারণ যেখানেই গেছে সেখানেই রহস্যময় কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বোর্ডিং স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হবে। ছেলেরা যে যার বাড়িতে চলে যাবে সবাই। দেখা গেল একজন বাদে সব ছাত্রই উঠেছে বাসে। হাডসন নেই কেন? জনি জানালো, তাকে তার বাবা এসে নিয়ে গেছেন। বাস ছেড়ে দিলো। এক হপ্তা পর স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেন একজন অভিভাবক, তার ছেলে হাডসন বাড়ি ফেরেনি কেন? স্কুল কর্তৃপক্ষের টনক নড়লো। খোঁজ খোঁজ। বোর্ডিং স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল, তালা খুলে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল হাডসন বাথরুমে মরে পড়ে আছে। আতংকে এবং খিদেতে মারা গেছে সে, বাইরে থেকে কেউ বন্ধ করে দিয়েছিল বাথরুমের দরজা। জনির বাড়িতে পুলিশ এলো, হাসি-খুশি জনি জানালো, হাডসনের কথা বলেনি সে, বলেছিল নেলসনের কথা—শুনতে ভুল করেছে কেউ। তখন মাত্র বারো বছর বয়স জনির, স্কুল কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামালো না। ভুল বোঝাবুঝি এবং

দুর্ঘটনা বলেই মেনে নিলো সবাই।

আরেক স্কুলের ঘটনা। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা দিচ্ছে ছাত্ররা। এক ছাত্রের মাথার ওপর দিয়ে এসিড ভরা বোতল আনতে গিয়ে কেমন করে জানি সেটা হাত থেকে পড়ে যায়। ছেলেটার শুধু মাথা আর মুখ পোড়েনি, চিরকালের জন্যে অন্ধ হয়ে যায় সে।

পেয়িং গেস্ট হিসেবে প্রথম যে বাড়িতে ছিলো জনি সেখানে কোনো বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছিলো না। ছিলো এক পাল কুকুর-বিড়াল। রহস্যময় দুর্ঘটনায় একের পর এক তিনটে বিড়াল আর একটা কুকুর মারা যাওয়ায় বাড়ির লোকজন জনিকে বিদায় করে দেয়।

এরকম আরো অনেক ঘটনার জন্ম দিতে দিতে এক সময় লেখাপড়া শেষ করে আর্মিতে ভর্তি হলো জনি। ট্রেনিং পিরিয়ডে তার খুব সুনাম হয়। অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারে, অথচ মুখের মিটিমিটি হাসিটা কখনো ম্লান হয় না। একটাই দোষ, আন-আর্মড কমব্যাট প্র্যাকটিস করার সময় প্রতিপক্ষকে এমন মার মারে যে প্রতিবার দু'একজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। জাতিসংঘের শান্তিবাহিনীতে যোগ দেয় জনি, লেবাননে পাঠানো হয় তাকে। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে দু'জন শিয়া মুসলমানকে খুন করে ফেলে সে। সামরিক আদালতে বিচার হয় তার। কিন্তু বিচারক তার হাসি-খুশি চেহারা আর আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর আচরণ দেখে বিভ্রান্ত হন, সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় জনি।

এরপর মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে বদলি হয় সে। স্পাই বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন একজন ইহুদিকে ইন্টারোগেট করার দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে। বন্ধ ঘরের ভেতর তিন ঘণ্টা ছিলো ওরা, জনি বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল লোকটা মারা গেছে। কোনো রকম কেলেংকারি সৃষ্টি না করে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় জনিকে। আর্মির ডাক্তারদের পরামর্শে তার বাবা তাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করেন, সেখানে সাইকিয়াট্রিস্টরা তাকে পরীক্ষা করে। দু'হপ্তা পর ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে চলে যায় জনি। সাইকিয়াট্রিস্টরা একবাক্যে রায় দেয়, রবার্ট পিয়ারসন মানসিকভাবে অসুস্থ—একটা সাইকোপ্যাথ। তার মধ্যে মানবিক কোনো ভাবাবেগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

মানুষ খুন করতে একটুও বাধে না জনির। খুন করা তার নেশা। এ-ধরনের একটা চরিত্র শয়তানরূপী কাউন্টের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কি।

বক্সের ভেতর ফোন বাজলো। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রিসিভার তুললো জনি। 'হ্যালো, সুইটি, শোনাও তোমার সুখবর।'

'বাম্পটনে যেতে পারো তুমি, কিন্তু ওখানে গিয়ে বলতে হবে প্যাকেট ছুটো যেন গ্লস্টার-এ আমাদের কন্ট্যাক্টের হাতে পৌঁছায়। গ্লস্টার কন্ট্যাক্টের সাথে ফোনে যোগাযোগ করো, কি পেতে যাচ্ছে বলে দাও তাকে।'

'ফুল ট্রিটমেন্ট?'

'অবশ্যই। আর জনি, একান্ত জরুরী অবস্থা না হলে মহামান্য চান না ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়ো তুমি। সে-রকম গুরু-

তর পরিস্থিতি দেখা দিলে যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তুমি, কিন্তু আপাততঃ তোমার কাজ হবে গোটা ব্যাপারটার ওপর সতর্ক নজর রাখা, এবং রিপোর্ট পাঠানো।'

মুহূর্তের জন্যে চেহারা কালো হয়ে গেল জনির। 'ঠিক আছে, সুইটি।' তারপরই আবার তার মুখে ফিরে এলো হাসিটা।

স্পীডোমিটারের কাঁটাটাকে কোনোমতেই পঁয়ত্রিশের ওপর ওঠানো গেল না। প্রায় সাড়ে তিনটের সময় সামনে বাম্পটন দেখতে পেলো ওরা। সলোমনের কাঁধে টোকা দিলো রানা, ইঙ্গিতে দেখালো ফোর্ডের পাশে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজছে রোয়েনা। রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়, মাঝখানে ফাঁকা একটা জায়গা, গাড়িটাকে সেখানে দাঁড় করিয়েছে সে। ফোর্ডের পাশে থামলো ট্রাক। বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে ভিজছে রোয়েনা, তবু দু'গালের রাঙা ভাবটুকু ম্লান হয়নি। ভারি খুশি আর উত্তেজিত মনে হলো তাকে। ভেজা কাপড় গায়ের সাথে সেঁটে আছে, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সলোমন। একমুহূর্ত রানাও চোখ ফেরাতে পারলো না।

ক্যাব থেকে সুড়সুড় করে নেমে এলো সলোমন। রোয়েনার সামনে দাঁড়িয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করলো। 'কি রকম লাগলো?'

'চমৎকার,' বললো রোয়েনা। সলোমনের দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের ভিজে কাপড়ের দিকে চট করে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, তারপর হাত দুটো ভাঁজ করলো বুকের ওপর। 'কোনো

অসুবিধে হয়নি।'

ট্রাক থেকে নেমে হেঁটে আসছে রানা। ওর দিকে ঘাড় ফেরালো সলোমন। 'ঠিকানাটা কি যেন?'

'আলমা কটেজ।'

'কোথায় সেটা?'

'কোথায় কে জানে। খুঁজে বের করতে হবে। রোয়েনা বরং এক চক্কর ঘুরে আসুক। কোন্ বাড়িটা জানার পর যাবো আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো সলোমন, পকেট থেকে টুইডের মানিব্যাগ বের করে রোয়েনার হাতে পাঁচটা পাউণ্ড গুঁজে দিলো। 'তোমার পেট্রল শেষ হয়ে এসেছে। আসার সময় খবরের কাগজ আর সিগারেটও নিয়ে এসো।'

ফোর্ড নিয়ে চলে গেল রোয়েনা। ট্রাকের ক্যাবে উঠে পড়লো ওরা দু'জন।

'ভাগ্য ভালো যে এখন পর্যন্ত কোনো রোড-ব্লকের সামনে পড়তে হয়নি,' বললো সলোমন।

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'ক্রাইডেথর্প থেকে দুশো মাইল দূরে চলে এসেছি। এখুনি ওরা এতো দূরে খুঁজবে না।'

'তাহলে এই লরড়মার্কা ট্রাক বাদ দিলেই হয়। মেয়েটাকে ভাগিয়ে দিই, তারপর ফোর্ডটা ব্যবহার করি।'

রাগ সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। 'মেয়েটাকে এখনো আমাদের দরকার। ভেবেছো খবরের কাগজে ওরা তোমার ছবি ছাপেনি? লোকজনের সামনে পড়লেই ধরা খেয়ে যাবে।'

অসন্তুষ্ট হলো সলোমন। তবে যুক্তিটা খণ্ডাতে পারলো না। 'বোধহয় তোমার কথাই ঠিক।'

সিটে হেলান দিলো রানা, পা দুটো যথাসম্ভব লম্বা করে দিয়ে শেষ সিগারেটটা ধরালো। মাথার ভেতর অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এ পর্যন্ত বেশ ভালোই এগিয়েছে সে। ডাকাতি করে জেলে গেছে, জেলখানা থেকে সলোমনের সাথে হাসপাতালে গেছে, হাসপাতাল থেকে পালাতেও কোনো অসুবিধে হয়নি। সলোমনের টাকার হদিশ জেনে নিয়ে বিদায় নিলো জনি, রোয়েনা ওদেরকে নিয়ে গেল ফার্মহাউসে। ফার্মহাউসে গিয়ে জানা গেল হোফার টুইড একটা খুনী, জেলখানা থেকে কয়েদীদের বের করে এনে কাউন্ট তাদের মেরে ফেলে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বদরুল হাসান ফার্মহাউস থেকে নিরাপদে চলে যেতে পেরেছে। তাকে খুন করার নির্দেশ হোফার টুইড পায়নি। কারণটা কি?

বদরুল হাসান রিপ হটন নয়, সে ছদ্মবেশী একজন বাঙালী, ব্যাপারটা ফাঁস হতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। তারপরও তাকে মেরে না ফেলার কি কারণ? মেরে ফেলাই যখন এদের রীতি?

কেন ভাবছে সে যে হাসান বেঁচে আছে? এমনও তো হতে পারে কাউন্টের পরবর্তী স্টেশনে সারা হয়েছে কাজটা?

হাসান প্রসঙ্গ ভুলে থাকার চেষ্টা করলো রানা।

হোফার টুইড কাউন্টের সাথে বেঈমানী করায় ওদের খুব সুবিধে হয়ে গেছে। টুইডের কাছ থেকে বাম্পটনের ঠিকানাটা না

পেলে গোটা ব্যাপারটাই ভেস্তে যেতো। ডাকাতি করে জেল খাটা, শান দেয়ার মেশিনে হাত দু'ফাঁক করা, ঝুঁকি নিয়ে হাসপাতাল থেকে পালানো, সবই বিফলে যেতো। হাসানের খোঁজ না পেয়েই, কাউন্টের পরিচয় না জেনেই, লণ্ডনে ফিরে যেতে হতো ওকে।

তবে এরপর কি ঘটবে তার ওপর নির্ভর করছে সাফল্য। অন্ধ একজন মহিলা, রুথ ব্ল্যানশি, কতোটুকু কি জানে সে?

বৃষ্টি কমেছে, রাস্তা থেকে নেমে এলো ফোর্ড। দেখেই ট্রাকের ক্যাব থেকে নেমে পড়লো সলোমন। ছুটে এলো রোয়েনা, বুকের সাথে চেপে ধরে আছে এক কার্টন সিগারেট, আর খবরের কাগজ। ট্রাকের ক্যাবে উঠলো সে, সলোমন আরেক পাশে বসলো।

'আলমা কটেজ শহরের এদিকটায়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রোয়েনা, আনন্দ আর উত্তেজনায় ছটফট করছে। 'বাড়িটার সামনে দিয়ে এই মাত্র গাড়ি চালিয়ে এলাম। মেইন রোডের ডান দিকে একটা গলি আছে, বাঁক থেকে দুশো গজের মতো লম্বা। গলির মাঝামাঝি জায়গায় বাড়িটা। দেখতে যা সুন্দর না!'

খবরের কাগজের ভাঁজ খুললো সলোমন. অমনি তার দিকে লাফ দিয়ে উঠলো মুখটা। ছবিটা জেলখানায় থাকতে তোলা নয়, অনেক আগের, সুটেড-বুটেড অবস্থায় কোর্টরুমে ঢুকতে যাবার আগের মুহূর্তে তোলা হয়েছিল। ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার উদ্দেশে সহাস্যে হাত নাড়ছে সলোমন।

'পোজটা মন্দ নয়, কি বলো?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন, কণ্ঠস্বরে গর্বের ভাবটুকু গোপন থাকলো না। 'আবার আমি ব্যাটাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি, হাহ্-হা!'

রানার সামনে সলোমন যেন হঠাৎ করে নিজের মুখোশ খুলে ফেললো। অপরাধের প্রতি দুর্বার ঝোঁক, ভয়ানক একটা কিছু সটিয়ে বসে নিজের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাকুল ইচ্ছে, এ-সবের ভেতরই লুকিয়ে থাকে আত্মধ্বংসের বীজ। কিন্তু রানা কিছু বললো না। সলোমনের ছবির নিচে ওরও একটা ছবি ছাপা হয়েছে, তবে একেবারে ছোটো, প্রায় স্ট্যাম্প সাইজ।

সলোমন দুঃখ করলো, 'তোমার কথা ওরা যেন ভুলেই গিয়েছিল। ছবিটায় এমনকি তোমার চেহারাও আসেনি।'

'সেজন্যে আমি খুশি,' বললো রানা। 'লোকে দেখলেও আমাকে সহজে চিনতে পারবে না। আরো খুশি হতাম কিছুই যদি ছাপা না হতো!'

'পাগল নাকি!' নির্ভেজাল বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সলোমন। 'পুলিশকে ঘোল খাওয়াবো, অথচ মানুষ জানবে না, তা কি হয়? নিজেকে এতো ছোটো ভেবো না তো। কতো আয়োজন, কতো কষ্ট, তারপর না জেল থেকে পালাতে পেরেছি? এরকম বাহাদুরি ক'জন দেখাতে পারে!'

রানা চুপ করে থাকলো।

'ও, বুঝেছি, ওখানে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছো।' কাগজটা ভাঁজ করে পায়ের কাছে ফেলে দিলো সলোমন। 'চলো, যাওয়া যাক।'

'ওখানে বিপদ হতে পারে, বলা যায় না। দু'জনের যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'খাঁটি কথা,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে রোয়েনার কাঁধে ভারি একটা হাত রাখলো সলোমন। 'আমি বরং থেকে যাই, মেয়েটাকে পাহারা দেবো।'

ক্যাব থেকে সবাই নামলো ওরা। রানা বললো, 'এক ঘণ্টার মধ্যে যদি না ফিরি, তুমি যাবে।'

'তখনো যদি এখানে আমি থাকি,' ঠাট্টা করলো সলোমন, নাকি ব্যঙ্গ, ঠিক বোঝা গেল না।

'কথাটা যখন মনে করিয়ে দিলে,' বললো রানা, 'সম্পদের একটা ভাগ দিয়ে দাও আমাকে। ফিরে এসে তোমাকে যদি না পাই, নিজের পথ নিজে দেখে নেবো।'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করলো সলোমন, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে পকেট থেকে টুইডের মানিব্যাগটা বের করলো। 'কোনো আপত্তি নেই।' গুণে পঁচিশ পাউণ্ড, আর কিছু খুচরো পয়সা রানার হাতে তুলে দিলো সে। 'কিন্তু এখন আমি জানবো কিভাবে যে তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে না?'

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রানা। হন হন করে হাঁটতে শুরু করে বললো, 'জানার কোনো উপায় নেই।'

মেয়েটার দিকে তাকালো সলোমন। চোখে লজ্জা নিয়ে তাকালো রোয়েনা, ভিজে চকচক করছে মুখ। তার কোমর জড়িয়ে ধরে, কাপড়ের ওপর দিয়ে পাঁজরের নিচের মাংসে মৃদু চাপ দিলো সলোমন। চোখ নামিয়ে নিলো রোয়েনা।

'এসো, সোনা-মণিক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। ট্রাকের পিছনে, কেমন? একটু বিশ্রাম নিই?'

'তুমি যা বলো, জো,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আগে আগে হাঁটলো রোয়েনা।

ট্রাকের পিছনে ওঠার সময় ট্রাউজারের বোতাম খুললো সলোমন। উত্তেজনায় হাত দুটো কাঁপছে।

চার

গলির কিনারা থেকে বেশ খানিকটা পিছনে বাড়িটা। খয়েরি পাথরে তৈরি, অর্ধেকটাই ঢাকা পড়ে আছে আইভি লতায়। সরু, লম্বা বাগান বৃষ্টিতে ভিজছে, ফুল বলতে সময়ের আগে ফোটা কিছু ড্যাফোডিল। পোর্চে উঠে ছোট্ট একটা নেমপ্লেট পড়লো রানা: রুথ ব্র্যানশি—শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে দেখা হবে।

দরজায় নক করলো রানা। ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এলো—কেউ যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে হাঁটছে। চাপা একটা গোঙানির আওয়াজও পাওয়া গেল। তারপর নিস্তব্ধতা। খানিক পর মেঝেতে ছড়ি ঠোকার আওয়াজ হলো, এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। কবাট খুলে গেল। দোরগোড়ায় বুড়ি এক মহিলা।

কম করেও আশি বছর বয়স হবে, হলুদ ফুলের শুকিয়ে যাওয়া পাপড়ির মতো মুখ, মাথার পিছনে খোঁপা করা সোনালি চুল। স্কার্টের সাথে টুইডের স্যুট পরে আছে বৃদ্ধা, গোড়ালি ছুঁই ছুঁই করছে স্কার্ট। বাঁ হাতে ছড়ি, ডান হাতে কুকুরের কলার।

জীবনে এতো সুন্দর ডোবারম্যান দেখেনি রানা। কালো।

ওটার গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এলো, যেন দূরে কোথাও গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে। কলার ধরা হাতটা ঝাঁকি দিলো বৃদ্ধা। 'শান্ত হও, টিম। হ্যাঁ, বলুন কে?'

কথার সুরে মৃদু অস্ট্রিয়ান টান লক্ষ্য করলো রানা। কলার ধরে ঝাঁকি দেয়ার সময় সামনের দিকে একটু এগিয়ে আসায় ঝাপসা, ধোঁয়াটে চোখ দুটো পরিষ্কার দেখতে পেলো রানা।

'এলাম, ভাবলাম আপনি যদি খানিকটা সময় দেন আমাকে,' বললো রানা।

'আপনি আমার পরামর্শ চান—প্রফেশনালি?'

'হ্যাঁ, জী।'

'কিন্তু আমি শুধু অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলেই মক্কেলদের সাথে কথা বলি। খুব সতর্ক থাকতে হয়। এ-সব ব্যাপারে আইনের খুব কড়াকড়ি।'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কিনা,' বললো রানা। 'আবার কবে আসা হবে ঠিক নেই। সত্যিই খুব উপকার হতো। আপনার অনেক প্রশংসা শুনে ভাবলাম···'

'আই সি!' বৃদ্ধা ইতস্তত করতে লাগলো। 'আপনার নাম?'

'নামের কোনো গুরুত্ব নেই,' বললো রানা। 'গুরুত্ব যদি থাকে তো সেটা গন্তব্যের।'

'কোথায় সেটা?'

'ব্যাবিলন।'

স্থির পাথর হয়ে গেল বৃদ্ধা, তারপর সামান্য একটু পিছিয়ে

গেল সে। 'তুমি বরং ভেতরে এসো, ইয়ংম্যান।'

দেয়ালে ওক কাঠের চকচকে প্যানেল, বিশাল আয়নার পাশে টেবিলের ওপর চীনামাটির টবে রঙচঙে ফুল ফুটে আছে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে কুকুরের কলারটা ছেড়ে দিলো বৃদ্ধা, রানার পাশে চলে এলো ডোবারম্যান।

'এদিকে।' হলরুমের আরেক দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলো বৃদ্ধা, মনেই হয় না অন্ধ।

দেখেই বোঝা যায় কামরাটা লাইব্রেরী, তিন দিকের দেয়ালে অনেকগুলো বুক-শেলফ ভর্তি বই আর বই। একধারে ফায়ার প্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে। জানালার কাঁচ ভেদ করে বাইরে চলে গেল রানার দৃষ্টি। বৃষ্টি ভেজা গাছপালার ওপাশে আঁকা-বাঁকা নদী বয়ে যাচ্ছে।

ছোটো একটা গোল টেবিলের পিছনে, চেয়ারে বসলো বৃদ্ধা, হাত তুলে সামনের একটা চেয়ার দেখালো। রানা বসতেই কুঁকুরটাও নিচু হলো, স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো ওর দিকে।

'কে তুমি, ইয়ংম্যান?' রুথ ব্ল্যানশি জিজ্ঞেস করলো।

'তাতে কি কিছু এসে যায়?'

'হয়তো যায় না,' কাঁধ ঝাঁকালো বৃদ্ধা। 'দেখি, তোমার হাতটা দাও আমাকে।'

মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে পড়লো রানা। 'জানতে পারি কেন?'

'আমার জন্যে ব্যাপারটা জরুরী। তুমি নিশ্চয়ই জানো মানুষের নিয়তি বলে দিতে পারি আমি? ভবিষ্যৎ দেখতে পাই!'

রানার হাত ধরলো বৃদ্ধা, ধরে রাখলো হালকাভাবে। বৃদ্ধার হাত ঠাণ্ডা, মসৃণ, কোনো কারণ ছাড়াই দাদী-মা, মখমল, গোলাপ-জল, আর আগরবাতির কথা মনে পড়ে গেল রানার। তারপর হঠাৎ শক্ত চাপ অনুভব করলো হাতে। অনেকটা যেন বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়ে চমকে গেল ও। লক্ষ্য করলো, বৃদ্ধার চোখ জোড়া আচমকা বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। তারপর, আগাম কিছু বুঝতে না দিয়ে, খালি হাতটা তুলে রানার মুখ স্পর্শ করলো। আঙুলগুলো আলতো স্পর্শে ঘুরে বেড়ালো সারা মুখে।

'খারাপ কিছু নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো বৃদ্ধা, পাকা ভুরু জোড়া এখনো কুঁচকে আছে। 'অন্য রকম আশা করেছিলাম, এই আর কি।' এক মুহূর্ত পর হাতটা ছেড়ে দিলো সে। 'তোমাকে এখানে পাঠালো কে?'

'তাতে কিছু এসে যায়?'

'না, পাসওয়ার্ড তো বলেছোই—কিন্তু তোমাকে আমি আশা করিনি।'

'তারমানে কি আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না?'

হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলো রুথ ব্ল্যানশি। 'তোমাকে পরবর্তী স্টেশনে পাঠাবার কোনো আয়োজন করা হয়নি। যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা নেই।'

'আমার সাথে গাড়ি আছে।'

'ও—তুমি একা?'

ইতস্তত করলো রানা। 'হ্যাঁ।'

ধোঁয়াটে, ঝাপসা চোখ জোড়া যেন রানার অন্তর ভেদ করে

গেল। সাথে সাথে টের পেলো ও, মিথ্যে বলে ধরা পড়ে গেছে। 'তাহলে সাহায্য করতে পারবেন আপনি?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে হয় পারবো। অন্তত বলে দিতে পারবো কোথায় তুমি যাবে। তবে তাতে তুমি যা খুঁজছো তা পাবে কিনা সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার—আরেক প্রসঙ্গ।'

রানার মনে হলো, বৃদ্ধা তাকে সাবধান করে দেয়ার চেষ্টা করলো। মৃদু হাসলো ও, বললো, 'ঝুঁকি যদি থাকেও, সেটা আমাকে নিতে হবে।'

'তাহলে পিছনের ডেস্কে যাও, ডান দিকের ওপরের দেরাজটা খোলা। অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড পাবে, একই রকম সব, একটা তুলে নাও। তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, ভিজিটিং কার্ডে কি লেখা আছে আমি জানি না, জানতে চাইও না।'

রানা দাঁড়াতেই অস্বস্তির সাথে নড়ে উঠলো ডোবারম্যানটা। গ্রাহ্য না করে ডেস্কের পিছনে এসে দাঁড়ালো ও। দেরাজ খুলে ভেতর থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করলো। কার্ডের চারদিকে কালো একটা বর্ডার। লেখাগুলো মাঝখানে। লং ব্যারো ক্রেম্যাটরিয়াম অ্যাণ্ড হাউস অভ রেস্ট—এড নিকলস—ডাইরেক্টর। ফোন: কেঞ্জ টু থ্রি নাইন।

'এবার তুমি চলে যাও, ইয়ংম্যান।'

মুখ তুলে তাকালো রানা, ভুরু কোঁচকালো, দু'আঙুলে ধরা রয়েছে ভিজিটিং কার্ডটা। বিপজ্জনক কিংবা অশুভ, কিছু একটা আছে এখানে। আড়ষ্ট বোধ করলো রানা। পরিবেশটা অস্বস্তিকর। ও এক চুল নড়েনি, অথচ কুকুরটা সিধে হয়ে চাপা আও-

য়াজ করলো গলার ভেতর। সাবধানে এক পা পিছু হটলো রানা। খুনী কুকুর, বুঝে ফেলেছে ও। একবার যদি হামলা করে, থামাতে হলে মেশিনগান লাগবে। যার নাম ডোবারম্যান পিনশার।

'তোমাকে আমি চলে যেতে বলেছি, ইয়ংম্যান,' আবার বললো রুথ ব্ল্যানশি। 'টিম তোমাকে পথ দেখাবে।'

যেন বৃদ্ধার সব কথাই বুঝতে পারে, সাথে সাথে দরজার দিকে এগোলো কুকুরটা। তাকে অনুসরণ করে রানা বললো, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ম্যাডাম ব্ল্যানশি। আপনি সত্যি আমার খুব উপকার করলেন।'

'সেটা এখনো দেখতে বাকি আছে, ইয়ংম্যান,' শান্ত গলায় বললো বৃদ্ধা। 'এবার যাও।'

পাবলিক টেলিফোন বুথটা গলির মাথায়, চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো রানা। রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার নম্বরে ডায়াল করলো ও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইন পাওয়া গেল। নতুন অফিস ইনচার্জ মৃণাল সেন রিসিভার তুললো, অপারেশনাল চীফ সোহানা চৌধুরীকে চাইলো রানা। 'মাসুদ ভাই, আপনি!' সবিস্ময়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো মৃণাল, তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বললো, 'জলদি, মৃণাল, সোহানাকে দাও।'

'দিচ্ছি, মাসুদ ভাই...।'

খট করে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ হলো, তারপরই শোনা গেল

সোহানার জলতরঙ্গ কণ্ঠস্বর, 'খোদার কাছে হাজারো শোকর। কেমন আছো তুমি, রানা?' রীতিমতো হাঁপাচ্ছে ও।

'কবে আমি খারাপ ছিলাম? শুজবারি থেকে বলছি, হাতে সময় কম। ফেজ—নাম শুনেছো জায়গাটার?'

'না। একটু ধরো, দেখে বলছি।' দেড় মিনিটের মাথায় আবার লাইনে ফিরে এলো সোহানা। 'গ্লস্টারের ঠিক বাইরে।'

'ওখানেই এখন যাচ্ছি আমরা। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতো চলছে। শোনো, মিঃ ম্যানফ্রেডকে বলে আজই বি. এস. এস. হেডকোয়ার্টার আর আমাদের অফিসের সাথে একটা হটলাইনের ব্যবস্থা করো, স্ক্র্যাম্বলার সহ। যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর সাহায্য দরকার হতে পারে আমার, কিন্তু ওদের ওখানে আমি ফোন করবো না—ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে ডাবল এজেন্ট না থাকাটাই আশ্চর্য। তাঁকে বলবে, এরপর যখন ফোন করবো, আমার হাতে সম্ভবত দু'চার সেকেণ্ডের বেশি সময় থাকবে না, এবং সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলতে হবে আমাকে।' রানা জানে, নোট নিচ্ছে সোহানা।

'ঠিক আছে,' বললো সোহানা। 'আর কিছু?'

'না।'

'রানা, হাসান কি...?'

'এখনো জানি না,' বললো রানা।

'কাউন্টের...?'

'এখনো জানি না। ছাড়ছি।'

উহু, কোমল একটা শব্দ হলো। চুমোর আওয়াজ। 'ভালো

থেকো।'

'কবে ছিলাম না? এই, বুধবার সন্ধ্যের সময় তৈরি থেকো, তোমাকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাবো।'

'কি!'

'আমি কখনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি?' রিসিভার নামিয়ে রেখে ফোন বক্স থেকে বেরিয়ে এলো রানা। আবার ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নাকে হাত চাপা দিয়ে বিকট শব্দে হ্যাঁচ্চো করলো ও। গাড়ি দুটোর কাছে পৌঁছে দেখলো, ভ্যানে বসে আছে রোয়েনা, ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাতের ভেতর সিগারেট নিয়ে টানছে সলোমন। রানাকে দেখে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলো সে। 'কি হলো?'

'বিশেষ কিছু না। বুড়ি শুধু এই কার্ডটা দিলো।'

কার্ডটা পড়ে মুখ তুললো সলোমন। 'এর মধ্যে বুড়ির কোনো চাতুরি নেই তো?'

'কি করে বলি!'

'তাহলে আমরা বিপদে পড়তে পারি।'

'পারি।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো সলোমন, চিন্তিত। 'তবে, ওরা অন্তত পুলিশ ডাকবে না।'

'তা ডাকবে না,' বললো রানা। 'এটা ওদের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধ।'

কোর্ডের ড্যাশবোর্ডে পুরনো একটা এ. এ. বুক পাওয়া গেল, খসখস করে সেটার পাতা ওল্টালো সলোমন। 'গ্লস্টারের ঠিক

বাইরেই ফেলব,' ঘোষণা করলো সে। 'এই ধরো, পঁচাত্তর মাইল। ফোর্ডে করে গেলে ঘণ্টা দুই লাগবে।'

'আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম,' বললো রানা। জঙ্গলের দিকে তাকালো ও। 'ভেতরে কোথাও ট্রাকটাকে রেখে আসলে এই আবহাওয়ায় সহজে কারো চোখে পড়বে না।'

'চমৎকার,' ঘাড় কাত করলো সলোমন। 'আমিই রেখে আসছি,' গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ট্রাকের দিকে চলে গেল সে।

হুইলের পিছনে বসলো রানা। 'সলোমন খুব ফুর্তিতে আছে, ব্যাপারটা কি?'

চোখ নামিয়ে নিলো রোয়েনা। তার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। রানার মনে হলো, আরে, দেখতে ততো খারাপ নয় তো! তারপরই মনে পড়লো—লাভ মেকস্ ইভেন অ্যান আগলি উওম্যান লাভলি...।

সর্বনাশ, হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠলো রানা। এ যে দেখছি গোদের ওপর বিষফোঁড়া! এমনিতেই মাথার ওপর ঘোরতর বিপদ, তার ওপর রোয়েনা আর সলোমনের সম্পর্ক জটিল হতে চলেছে। কি যে আছে কপালে!

রানার পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই কবাটের মতো খুলে গেল একটা বুক-শেলফ, ভেতর থেকে মিটিমিটি হাসি নিয়ে বেরিয়ে এলো জনি। টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো সে। 'বুড়ি খুকি, তোমাকে ধন্যবাদ,' বললো সে। 'গোটা ব্যাপারটা

বেশ সুন্দরভাবে সামলেছো।'

'সুন্দর কিনা সেটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।'

'বললো সাথে কেউ নেই, তারমানে মিথ্যে কথা বলে গেল। আমার ধারণা গলির মাথায় অপেক্ষা করছে সলোমন। তোমার ফোনটা ব্যবহার করলে কিছু মনে করবে?'

'আমাকে তুমি ব্যবহার করেছো। ফোন ব্যবহার করতে বাধা দিই কিভাবে?'

'পেট ফেঁপেছে? নাকি বড় বেশি উকুন? কথায় এতো ঝাঁঝ কেন, বুড়ি খুকি?' একটা নম্বরে ডায়াল করলো জনি, অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পেয়ে বললো, 'এড নিকলস? প্যাকেট দুটো পথে রয়েছে। হ্যাঁ, ফুল ট্রিটমেন্ট। পরে আমি তোমার সাথে দেখা করবো।' রিসিভার নামিয়ে রাখলো সে, দস্তানা জোড়া পরলো। 'এবার আমাকে কেটে পড়তে হয়, বুড়ি খুকি। আসবো, আবার আমি আসবো।'

গাঢ় একটা ছায়ার মতো জনিকে পাশ কাটিয়ে এগোলো ডোবারম্যান, রুগ ব্যানশির হাত শুঁকলো। 'আমার তা মনে হয় না,' হঠাৎ বললো বৃদ্ধা।

'মানে?' জনি হাসছে।

'মানে তুমি আর আমার কাছে আসবে না।'

'বুড়ি খুকি, নিজের পায়ে কুড়োল মারতে চাও? সেই উনিশ শো ছেচল্লিশ থেকে জাল পাসপোর্ট আর ভুয়া কাগজ-পত্র নিয়ে এখানে কারবার করছো। পুলিশে একটা খবর দিলে···।'

'তুমি ভুল বুঝছো,' বললো বৃদ্ধা। 'হঠাৎ করে আমি দুঃসাহসী

হয়ে উঠেছি, ব্যাপারটা তা নয়। তোমাকে অগ্রাহ্য করার জন্যে যে শক্তির দরকার এই বয়সে আমার তা নেই। প্রথমে নাৎসীরা আমাকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু সে-কথা কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। এখন তোমরা আমাকে ব্যবহার করছো, কিন্তু আমি অসহায়। আমি আসলে বলতে চাইছিলাম, আমার সাথে দেখা করা তোমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।'

জনি কৌতূহল প্রকাশ করলো, 'জানতে পারি, কেন?'

'কারণ তুমি মারা যাবে।'

বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে থাকলো জনি, হাসিটা ঝুলে আছে ঠোঁটে। 'তামাশা করছো, বুড়ি খুকি?'

'তুমি জানো করছি না। আমার মধ্যে সাইকিক পাওয়ার আছে। ভবিষ্যতের ঘটনা বলে দিতে পারি। মৃত্যু তোমাকে চিহ্নিত করেছে। পরিষ্কার অনুভব করছি আমি।'

অবাক ব্যাপার, কেন যেন কথাগুলো জনি হেসে উড়িয়ে দিতে পারলো না।

জনি যে কথাগুলো বিশ্বাস করেছে, হঠাৎ করে তা বুঝে ফেলে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলো রুথ ব্ল্যানশি।

'তুমি অমঙ্গলের প্রতীক, বুড়ি খুকি,' বললো জনি, তার হাতে বেরিয়ে এলো ছুরিটা, আলো লেগে ঝিক্ করে উঠলো ফলা। 'আমার আগে তোমাকে যদি যমের বাড়ি পাঠাই, তাহলে?'

মনে হলো দূরে কোথাও গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে, আসলে আওয়াজটা বেরিয়ে এলো ডোবারম্যানের গলা থেকে। কুকুরটার ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। খালতো করে সেটার গায়ে হাত

বুলালো বৃদ্ধা। 'সম্ভব নয়। তার আগে টিম তোমাকে খুন করবে।'

'সেই সাথে প্রমাণ হয়ে যাবে তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ছিলো? বুড়ি খুকি, জানতে ইচ্ছে করে, কুকুরটা কি শুধু তোমার প্রটেকশনের জন্যে, নাকি আরো কাজ-কাম উদ্ধার হয়?' অশ্লীল শব্দে হাসলো সে, ছুরিটা চালান করে দিলো পকেটে। 'না, ব্র্যানশি, হাজার হোক তুমি পুরনো পাপী, তোমার প্রাপ্য চোখ-ঝলসানো মৃত্যু। আর আমার মৃত্যুর কথা যদি বলো, তাকে আমি খুঁজতে যাবো কোন্ দুঃখে? আগেও আমাদের দেখা হয়েছে। আমার মুখ তার চেনা।'

শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল জনি, তার পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

পাঁচ

সেলুনে যেমন চুল ছাঁটা হয়, ক্রেম্যাটরিয়ামে তেমনি লাশ পোড়ানো হয়। পোড়াবার আগে এমবামিং রুমে রাখা হয় লাশ। ওখানে প্রাণহীন দেহের যত্ন নেয়া হয়। সুগন্ধী মাখানো থেকে শুরু করে মৃতদেহের ভেতর থেকে নানা অঙ্গ-প্রতঙ্গ বের করা পর্যন্ত সবই এই যত্নের আওতায় পড়ে।

চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। এমবামিং রুমে একা কাজ করছে এড নিকলস, তার রাবার অ্যাপ্রনে রক্ত লেপ্টে রয়েছে। নিজের হাতে এ-ধরনের কাজ না করলেও চলে তার, কিন্তু কাজ-পাগল লোক সে, আর তাছাড়া এ-ধরনের একটা কাজ নিখুঁতভাবে করতে পারার মধ্যে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি আছে।

এই মুহূর্তে যুবতী এবং কুমারী একটা মেয়ের লাশ নিয়ে কাজ করছে এড নিকলস। লাশের ভিসেরা বের করছে সে। এই কাজে সবাই রাবার গ্লাভ পরে, সেটাই নিয়ম, কিন্তু নিকলস জিনিসটা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। নগ্ন হাত দিয়ে

মানুষের নাড়িভুঁড়ি, ফুসফুস-হৃৎপিণ্ড, ইত্যাদি ছুঁতে পারার মধ্যে আলাদা মজা আছে।

অ্যাবডোমেন থেকে সমস্ত কিছু দক্ষতার সাথে বের করে আনলো নিকলস। এখন সে পাঁজরের ভেতর যা কিছু আছে, অত্যন্ত সাবধানে একে একে বের করে আনছে। শিস দিচ্ছে না, তবে নাক থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা গরম বাতাস সে রকমই আওয়াজ করছে। কি এক অদ্ভুত লোভ নাকি তৃপ্তিতে কে জানে, চোখ জোড়া চকচক করছে তার। হাত দুটো কনুই পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি।

তার পিছনে খুলে গেল দরজা, লম্বা হাড্ডিসার এক লোক ঢুকলো ভেতরে। লোকটার গাল বসা, চোখ দুটো গর্তের ভেতর, শুকনো ফ্যাকাশে চেহারা, যেন কতো বছর খেতে পায়নি। নিকলসের মতো সে-ও একটা রাবার অ্যাপ্রন পরে আছে। 'আমি কোনো সাহায্যে আসবো, মিঃ নিকলস?' জানতে চাইলো সে।

'আজ রাতে আর মেয়েটাকে খোঁচাবো না, মাইকেল,' বললো নিকলস। 'মগজে হাত দেবো কাল। এখন আমাকে কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হবে, হিশাবে অনেক গোলমাল আছে। ধরো দেখি, ওকে ট্যাংকে শুইয়ে দিই।'

হোস পাইপের পানি তাক করে লাশটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলা হলো, তারপর দু'জন ধরাধরি করে ফরম্যালডিহাইড ভরা প্রকাণ্ড এক কাঁচের ট্যাংকে নামিয়ে দিলো। ছলাৎ করে মৃদু শব্দের সাথে ডুবলো লাশটা, বার কয়েক পাক খেলো, তারপর

তলা থেকে দুই কি দেড় ফুট ওপরে স্থির হয়ে গেল। লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়লো মাথার পিছনে আর দু'পাশে।

'স্রেফ একটা অপচয়, তাই না, মিঃ নিকলস?' দীর্ঘশ্বাস ফেললো মাইকেল। 'মেয়েটা সত্যি অপরূপ সুন্দরী ছিলো।'

'সুন্দর হোক বা কুৎসিত, ছুঁড়ি হোক আর বুড়ি, সবাইকেই এই অবস্থায় পৌঁছুতে হবে, মাইকেল,' সহাস্যে বললো নিকলস। 'আর সবাই চলে গেছে?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তাহলে তোমারও চলে যাওয়া দরকার। আমি···আমার তো এখনো অনেক কাজ বাকি।'

'আপনি বললে···'

'কোনো দরকার নেই তার, আমি একাই হিশেব মেলাতে পারবো।'

মাইকেল হাসলো। 'ভালোই হলো, স্যার। স্ত্রীকে বলে এসেছি আজ রাতে ওকে বাইরে খেতে নিয়ে যাবো···।'

'মিচেল্নার স্ট্রীটের গোল্ডেন ড্রাগনে যাও তাহলে,' পরামর্শ দিলো নিকলস। 'সব আইটেমই ওরা খুব ভালো করে।'

'ধন্যবাদ, স্যার। তাই যাবো।'

মাইকেল চলে যেতে সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে হাত থেকে রক্ত ধুলো নিকলস, অ্যাপ্রন খুলে সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকলো। উলঙ্গ হয়ে গোসল করলো সে। শাওয়ারের গরম পানি পেশীগুলোর টান টান ভাব দূর করে দিলো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নরম একটা শাদা শার্ট পরলো সে, কালো টাই বাঁধলো গলায়,

সবশেষে সুন্দর একটা স্যুট পরলো। তুষার সাদা চুল তার, সোনালি ফ্রেমের চশমায় দারুণ মানালো। এখন তাকে লং ব্যারো ক্রেম্যাটরিয়াম অ্যাণ্ড হাউস অভ রেস্ট-এর ডিরেক্টর বলে মেনে নিতে কারো আপত্তি থাকবে না। ম্যাট ইসটনের সাথে তার এই চেহারার এখন আর মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। ম্যাট ইসটন অর্গানাইজড ক্রাইম সিণ্ডিকেটের পক্ষে দু'আড়াই বছর কাজ করে তিন বার জেল খেটেছে, কিন্তু তারপর পেরিয়ে গেছে দুই যুগেরও বেশি সময়।

সময় এবং পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এমবামিং রুম থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগোলো নিকলস। মেঝেতে পুরু কার্পেট, গোড়ালি পর্যন্ত পা ডেবে যায়। দু'পাশের দেয়ালে ওক কাঠের প্যানেল। চারদিক ঝকঝক তক তক করছে। শেড পরানো ল্যাম্প থেকে কোমল, মৃদু আলো আসছে। হ্যাঁ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তুলতে দেদার টাকা খরচ করেছে সে। জীবনাবসানের পর কতো মানুষের শেষ বিশ্রামের জায়গা এটা, সব কিছু রুচিসম্মত, সুন্দর, আর চোখ ঝলসানো না হলে চলবে কেন। অথচ কেউ কি ভাবতে পারে গোটা প্রতিষ্ঠানটাই আসলে একটা অপরাধের ফসল?

ম্যারিয়ন ওয়াকার ছিলো নিঃসঙ্গ বিধবা, চোখে কম দেখতো, বয়স হয়েছিল সত্তরের ওপর। ব্যাংকে ছিলো স্বামীর রেখে যাওয়া দু'লাখ পাউণ্ড, তার সুদ আর নিজের মাসিক পেনশন থেকে যা পেতো একা মানুষ খুবই ভালো দিন কাটছিল। এই সময় বন্ধুর ছদ্মবেশে তার জীবনে ঢুকলো শনি। বৃষ্টি ঝরা এক সকালে রাস্তা

পার হতে যাবে সে, দয়ার শরীর নিয়ে এগিয়ে এসে তার মাথায় ছাতা ধরলো এক যুবক।

ফরেস্ট হিলের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে গেল ম্যাট ইসটন। গাড়ি চালায়, ফাই-ফরমাশ খাটে, রান্নাবান্না করে, সব কাজেই তার প্রচুর উৎসাহ। বৃদ্ধার প্রিয়পাত্র হয়ে ভেতরে ঢুকলো সে, তারপর দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা নিয়ে একটু একটু করে এগোলো। ধর্মোপদেশ দিয়ে শুরু করলো সে। পাপীদের জন্যে কি শাস্তি অপেক্ষা করছে, কোন্ কাজটা পাপ কাজ, এ-সবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো ম্যারিয়ন ওয়াকার। প্রয়োজনের তুলনায় কম খেলে, আত্মপীড়নে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে পাপ-মুক্তির সম্ভাবনা আছে, কথাগুলো মেনে নিয়ে অনুশীলন শুরু করলো সে। ওদিকে খাবারের সাথে স্লো-পয়জন দিয়ে যাচ্ছে ম্যাট ইসটন। দিনে দিনে শরীর ভেঙে পড়লো বৃদ্ধার। সে বুঝলো, দিন ফুরিয়ে এসেছে। ম্যাট ইসটন তাকে অভয় দিয়ে বললো, তার জন্যে সারা জীবন প্রার্থনা করবে সে। মারা যাবার ক'দিন আগে বাড়ি, ব্যাংকের টাকা, পেনশন, সমস্ত কিছু ইসটনের নামে উইল করে দিলো বৃদ্ধা। সে মারা যাবার পর দূর সম্পর্কের এক ভাইঝি সম্পত্তি আদায় করার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু আইন তাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারলো না।

হাতে টাকা আসার সাথে সাথে বদলে গেল লোকটা। প্রথম সুযোগেই বাড়িটা বিক্রি করে দিলো, সমস্ত টাকা তুলে নিলো ব্যাংক থেকে। সবশেষে নামটাও বদলে ফেললো।

সব কিছুই বেশ চমৎকারভাবে শুরু হলো। ব্যবসা তুঙ্গে, দু'-হাতে টাকা কামাচ্ছে এড নিকলস। কিন্তু অনেক বছর পর হঠাৎ করে তার জীবনে উদয় হলো রবার্ট পিয়ারসন ওরফে জনি। দেখা গেল ম্যাট ইসটন সম্পর্কে কিছুই তার অজানা নেই। কাজেই তার কথায় নাচতে রাজি হতে হলো নিকলসকে। রাজি হলো, কিন্তু মনে মনে তৈরিও থাকলো, সুযোগ আর সুবিধে মতো কাঁটাটা উপড়ে ফেলবে সে।

মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় নতুন কেনা ইনসিনারেটর মেশিনটার কথা মনে পড়লো তার। মাত্র গত হপ্তায় বসানো হয়েছে ওটা। একটা মানবদেহকে পুড়িয়ে ছাই করতে স্রেফ পনেরো মিনিট সময় নেবে। পুরনো মেশিনটায় কাজ করতে নানা রকম অসুবিধে হচ্ছিলো। ওটা সময় নিতো দেড় ঘণ্টা। তাছাড়া, অনেক সময় খুলি আর পেলভিস ভেঙে টুকরো না করে দিলে ঠিকমতো পুড়তো না। জনির কথা আবার মনে পড়লো তার। সুদর্শন, কিন্তু লম্বা-চওড়া নয় সে—তার বেলায় নতুন মেশিনটা সম্ভবত দশ মিনিটের বেশি নেবে না।

অফিসে ঢোকার মুখে মেয়েটাকে দেখতে পেলো নিকলস, রিসেপশন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পায়ের আওয়াজে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘুরলো সে। 'আমি মিঃ এড নিকলসের সাথে দেখা করতে চাই।'

'আমিই। বলো কি করতে পারি?' আপাদমস্তক খুঁটিয়ে মেয়েটাকে দেখলো নিকলস। অল্প বয়স, দেখতে কুৎসিত, পরনে নোংরা কাপড়চোপড়। এখানে কেন এসেছে ও, কোন্ বুদ্ধিতে?

জানে না, এখানে শুধু ধনী লোকদের লাশ পোড়ানো হয় ?

'আমার এক আত্মীয়া···তার ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'

'তোমার কে ?'

'দাদী-মা।'

'সদ্য মারা গেছে ?'

'আজ সকালে। আমার ইচ্ছে দাদী-মার খুব যত্ন নেয়া হোক। আপনি মিঃ এড নিকলস ?'

'হ্যাঁ, আমিই সে,' নিকলস দীর্ঘশ্বাস ফেললো। মনে মনে ভাবলো, একেই বলে গরীবের ঘোড়া রোগ। মেয়েটার দৈন্য দশা দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেলো তার। তারও হাভাতের ঘরে জন্ম হয়েছিল। 'শোনো, মেয়ে—তোমার এই শোকে আমি বড় জোর আন্তরিকভাবে সান্ত্বনা দিতে পারি। তুমি বোধহয় জানো না, এখানে আমরা স্পেশালাইজড সার্ভিস দিয়ে থাকে। বিস্তর খরচের ব্যাপার··· ।'

দাঁত দিয়ে একবার নখ খুঁটলো মেয়েটা, তারপর মুখ তুলে বললো, 'দাদী-মার ইন্সুরেন্স করা আছে।'

'জানতে পারি কতো টাকার ?'

'এক হাজার পাউণ্ড। ওতে হবে না ?'

মেয়েটার ব্যাকুল দৃষ্টি নিকলসের অন্তর ছুঁয়ে গেল। বেশির-ভাগ অপরাধীর মধ্যেই হাতে অগাধ টাকা আসার পর মানবিক গুণের পরিচয় দেয়ার একটা ঝোঁক চাপে, সে-ধরনের একটা ঝোঁক এই মুহূর্তে নিকলসের মধ্যেও চাপলো। মেয়েটার কাঁধে আস্তে

করে একটা হাত রাখলো সে, অভয় দিয়ে হাসলো, বললো, 'ঠিক আছে, কি করা যায় দেখবো। কাল সকালে এসো, মন ভালো থাকলে তোমার কাছ থেকে কোনো টাকাই আমি নেবো না।'

'কাল সকালে?' হতাশ হলো মেয়েটা। 'কিন্তু আমি যে আজ রাতেই সব ব্যবস্থা করে যেতে চেয়েছিলাম!'

'কিন্তু আমি একেবারে একা, স্টাফরা সবাই বাড়ি চলে গেছে।' মেয়েটার চেহারা কালো হয়ে যাচ্ছে দেখে দয়া হলো তার। 'ঠিক আছে, কতোক্ষণই বা লাগবে। এসো, আমার অফিসে এসো। কাগজ-পত্রে সই করতে হবে।'

পথ দেখিয়ে মেয়েটাকে অফিস রুমে নিয়ে এলো নিকলস। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে সাজানো ঘরটা দেখলো মেয়েটা। ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসলো নিকলস, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালো। খানিক ইতস্তত করে বসলো মেয়েটা।

ডেস্ক-ডায়েরী খুললো নিকলস, ঝর্ণা কলম খুলে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম বলো।'

'টুইড, রোয়েনা টুইড।'

'ঠিকানা?'

'ঠিক জানি না,' ঝট্ করে মুখ তুললো নিকলস। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রোয়েনা আবার বললো, 'বাড়িটা ব্যবিলনে যাবার পথে পড়ে আর কি।'

ঘরের ভেতর জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এলো। রোয়েনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নিকলস, স্নেহমাখা হাসিটুকু অদৃশ্য হয়েছে আগেই। 'আচ্ছা!' ডায়েরীটা বন্ধ করলো সে, দেরাজ

খুলে রেখে দিলো, একই হাত দিয়ে পয়েন্ট থ্রি টু অটোমেটিকটা ধরলো, তারপর ধীরে ধীরে পকেট ভরলো সেটা। রোয়েনা ব্যাপারটা টেরই পেলো না।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো নিকলস। 'এসো আমার সাথে।'

দাঁড়াতে গিয়ে রোয়েনা অনুভব করলো তার পা দুটো কাঁপছে। আতংকে ঘামতে শুরু করলো সে। এরপর কি করতে হবে তার জানা নেই। নিকলস তার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় ভয়ার্ত চোখে তাকালো সে, করুণা প্রার্থনার ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে চেষ্টা করলো।

'ভয় পাবার কিছু নেই,' অভয় দিলো নিকলস। 'দোতালায় বসে কথা বলবো আমরা।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, নিকলসের পিছু পিছু দোতালায় উঠে এলো রোয়েনা। চামড়া মোড়া একটা দরজার সামনে থামলো নিকলস, কবাট মেলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো এক-পাশে।

ঘরের ভেতর ছায়া বেশি, আলো কম। ইতস্তত করতে করতে পা বাড়ালো রোয়েনা। ফরম্যালডিহাইডের গন্ধ ঢুকলো নাকে। মৃদু আলোয় ট্যাংকের ভেতর লাশটা দেখে এক পা পিছু হটলো সে। পিছনে ক্লিক শব্দের সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো রোয়েনা। তাকে পাশ কাটিয়ে এগোলো নিকলস। নির্লিপ্ত চেহারা। বড় একটা মেহগনি কেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে ক্ষুরের মতো ধারালো একটা স্ক্যালপেল তুলে নিলো সে, আলোর নিচে খুঁটিয়ে

পরীক্ষা করলো ফলার কিনারা, ভুরু জোড়া কুঁচকে থাকলো মুহূর্ত। তারপর খপ্ করে রোয়েনার কোটের সামনেটা খামচে ধরলো, টান দিয়ে নিজের বুকের ওপর নিয়ে এলো তাকে, দুই মুখের মাঝখানে এক কি দেড় ইঞ্চি ফাঁক। গলার চামড়ায় ধারালো স্ক্যালপেলের স্পর্শ পেয়ে শিউরে উঠলো রোয়েনা।

'কে তুমি? তোমার সাথে আরেকজনের থাকার কথা, সে কোথায়? জলদি বলো, নয়তো এখুনি তোমার গলা কাটবো।'

পাগলের মতো হয়ে গেল রোয়েনা। নিকলসকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার জুড়ে দিলো।

লং ব্যারো এস্টেটের গেট থেকে একশো গজ দূরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা বট গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ফোর্ডটা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাড়িটার বিশাল কাঠামো দেখতে পেলো সলোমন, আলো জ্বলছে পোর্চে। একে বৃষ্টি, তার ওপর রাত, বেশি কিছু আর দেখা গেল না। এই সময় অন্ধকারে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। পাশে এসে দাঁড়ালো রানা।

'গেটে একটা নোটিশ ঝুলছে,' বললো ও। 'রোজই ছ'টায় বন্ধ হয়ে যায়। বাজে ক'টা?'

'সোয়া ছ'টা,' লিউমিনাস ডায়ালে চোখ রেখে বললো সলোমন।

'ঘুর ঘুর করার সময় দেখলাম গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল এক লোক। তবে গাড়ি-বারান্দায় আরো একটা গাড়ি আছে—দূর থেকে দেখে মার্সিডিজ বলে মনে হলো।'

'মালিক ছাড়া আর কে মাসিডিজ ব্যবহার করবে।'

'ঠিক,' বললো রানা। 'কিন্তু যাই বলো, আমার কিন্তু খুঁতখুঁত করছে।'

'ভাবছো আমরা আসবো জেনে ছুরিতে শান দিচ্ছে ওরা?' ঝাঁঝের সাথে বললো সলোমন। 'হয়তো তাই, কিন্তু ঝুঁকি না নিয়েই বা আমাদের উপায় কি?'

'উপায় নেই, কিন্তু ইচ্ছে করলে আমরা সাবধান হতে পারি,' বললো রানা, কোর্ডের জানালা দিয়ে ভেতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে রোয়েনার দিকে তাকালো। 'তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারো, বুঝলে। চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

'অবশ্যই,' বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এলো রোয়েনা। 'কি করতে হবে বলে দিন শুধু।'

'সোজা ভেতরে ঢুকে গিয়ে এড নিকলসকে চাইবে। তারপর কি করতে হবে শিখিয়ে দিলো রানা। 'সুযোগ পেলে ব্যবিলন শব্দটা উচ্চারণ করবে, এটাই তোমার আসল কাজ।'

'আমরা কি করবো?' জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'আমি পিছন থেকে বাড়িটায় ঢুকবো,' বললো রানা। 'তুমি সামনে দিয়ে বা ডান-বাম যে-কোনো এক দিক দিয়ে,' রোয়েনার দিকে ফিরলো ও। 'তোমার কাছেপিঠেই আমরা থাকবো। কি, পারবে বলে মনে করো?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালো রোয়েনা। তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো সলোমন।

'তোমার কোনো ভয় নেই, ডার্লিং,' বললো সে। 'কেউ

তোমার গায়ে আঁচড়টি কাটলে আমি তার ঘাড় মটকাবো।'

এ-সবই ফাঁকা বুলি, তবে রোয়েনা সরল বিশ্বাসে সলোমনের কনুই আঁকড়ে ধরলো। 'আমি জানি, জো। তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

নির্দয় সলোমন শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে প্রতিবাদ করলো না। মনে মনে ভাবলো, বেশ্যা মাগী বলে কি! মেয়েটার কাঁধ চাপড়ে দিলো সে, অভয় দিয়ে হাসলো। 'আমাকে দরকার হলেই চেঁচাবে, এক ছুটে পৌঁছে যাবো আমি।'

পরিস্থিতি অন্য রকম হলে হো হো করে হেসে উঠতো রানা, হাসলো না শুধু মেয়েটার করুণ অবস্থার কথা ভেবে। ভাবাবেগে বিচলিত হবার সময় এটা নয়, কাজেই তাড়া লাগালো ও, 'এবার যাও, রোয়েনা। কেউ বাধা না দিলে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়বে। আর মনে আছে তো, আমরা তোমার কাছেপিঠেই থাকবো।'

ছয়

গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে স্রোতস্বিনী নদীর মতো কলকল ছলছল শব্দে ছুটে চলেছে পানি, গেটের পাশে গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা আর সলোমন। ধাপ কটা বেয়ে পোর্চে উঠলো রোয়েনা, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না। পোর্চের আর্ধেক মাথায় কাঁচ লাগানো দরজা, রিসেপশন রুম, ভেতরে আলো জ্বলছে। একটা ডেস্কের কোণ, খানকয়েক চেয়ার দেখা গেল।

সলোমনের দিকে ফিরলো রানা। 'আমি পিছন দিয়ে ঢুকি, তুমি এদিক দিয়ে পারো কিনা দেখো।' বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত হারিয়ে গেল ও।

গেটের ভেতর ঢুকে রডোডেনড্রন ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে এগোলো সলোমন। সিঁড়ি বেয়ে একজন লোককে নামতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, পোর্চ থেকে মাত্র দশ-বারো গজ দূরে। লোকটার পরনে গাঢ় রঙের স্যুট, অস্বাভাবিক সাদা চুল মাথায়। রোয়েনার সাথে এক মিনিট কথা বললো সে। তারপর

দু'জনেই বাঁ দিকের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। রোপের ভেতর দিয়ে আরো খানিক সামনে বাড়লো সলোমন।

ধাপ ক'টার পাশে ছায়ায় দাঁড়ালো সে, একটা পিলারের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে থাকলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার রিসেপশনে বেরিয়ে এলো লোকটা রোয়েনাকে নিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল ওরা।

চেহারায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সলোমন, কি করবে ভাবছে। এই প্রথম সে উপলব্ধি করলো, হাসপাতাল ছেড়ে পালাবার পর থেকে সিদ্ধান্ত যা নেয়ার সব রানাই নিয়েছে। হঠাৎ বৃষ্টির বেগ বেড়ে যাওয়ায় গা বাঁচাবার জন্যে ধাপ বেয়ে পোর্চে উঠে পড়লো সে, কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো রিসেপশনে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কান পাতলো সলোমন। গোটা বাড়িতে কবরের নিস্তব্ধতা। ধীরে ধীরে এগোলো সে, মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো। সিঁড়ির মাথায় উঠেছে, এমনি সময়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে উঠলো রোয়েনা।

পালাবার জন্যে সাথে সাথে ঘুরলো সলোমন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার আর্তনাদ করে উঠলো রোয়েনা। সলোমনের পরবর্তী আচরণ স্রেফ হয়তো রিফ্লেক্স অ্যাকশন, কিংবা হয়তো নিজেকে নিয়ে তার যে গর্ব আছে সেটারই অবদান। চামড়া মোড়া দরজা খুলে তীরবেগে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। রোয়েনা আর সেই লোকটা, দু'জনেই দরজার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। একটা

বেঞ্চের ওপর রোয়েনাকে পেড়ে ফেলেছে নিকলস, ধারালো স্ক্যালপেলটা রোয়েনার গলার ওপর নামছে।

তারস্বরে চিৎকার করছে রোয়েনা, সলোমনের নাম ধরে ডাকলো একবার। পিছন থেকে নিকলসের কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো সলোমন, ঘোরালো, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো বেঞ্চের ওপর। স্প্রিঙের মতো লাফ দিয়ে সলোমনের বুকের ওপর পড়লো রোয়েনা। তার চেহারা ভয়ে কদাকার হয়ে উঠেছে। অভয় দিয়ে তার পিঠে হাত বুলালো সলোমন। বেঞ্চ থেকে উঠলো নিকলস, সিধে হলো, পিস্তল সহ হাত বের করলো পকেট থেকে।

রোয়েনার বিপদে জড়িয়ে পড়ায় নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো সলোমনের। আত্মরক্ষার ব্যাকুল আগ্রহে রোয়েনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েই দরজার দিকে ছুটলো সে।

একটা মাত্র গুলি করলো নিকলস। ট্যাংকের পুরু কাঁচে নিখুঁত একটা ফুটো তৈরি হলো, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো ফরম্যালডিহাইডের মোটা একটা ধারা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে সলোমন। ধীরে ধীরে সিধে হলো সে। শান্ত কণ্ঠে পিছন থেকে নিকলস বললো, 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। হাত দুটো মাথার ওপর,' রোয়েনাকে সামনের দিকে একটু ঠেলা দিলো সে। 'হাঁটো, দু'জনেই।'

করিডর ধরে এগোলো সলোমন। পাশে থাকলো রোয়েনা, দু'পাটি দাঁত ঠক ঠক আওয়াজ করছে। রানার ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। সলোমন ভাবলো, গুলির আওয়াজ শুনে এক মাইল

দূরে সরে গেছে নাহিদ। রাগ হলো তার, কিন্তু আবার এ-কথাও ভাবলো যে নাহিদের জায়গায় সে হলেও ঠিক তাই করতো। অন্য কারো জন্যে মৃত্যুর মুখে কোন্ বোকা দাঁড়াতে চায়?

নিকলসের নির্দেশে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো ওরা। রিসেপশনে অনেকগুলো দরজা, তার একটা দিয়ে হলঘরে ঢুকলো তিনজন। আলো জ্বাললো নিকলস। সলোমন দেখলো, একটা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ধাপগুলো নিচের দিকে নেমে গেছে, নিচেটা দেখে মনে হলো এককালে জায়গাটা সম্ভবত ওয়াইন সেলার ছিলো, কিছু দিন হলো দেয়ালগুলো রঙ করা হয়েছে সাদা আর কালোয়। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় এক দিকের দেয়ালে জটিল একটা সুইচবোর্ড দেখলো সলোমন। উল্টোদিকের দেয়ালে কয়েকটা স্টীল আভনডোর। ব্যাখ্যা করার দরকার হলো না, সলোমন বুঝতে পারলো ক্রেম্যাটরিয়ামে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে। কেন, তাও বলে দেয়ার দরকার করে না। পরিবেশটা গুমোট, তবু আকস্মিক ঠাণ্ডায় হি হি করতে লাগলো সে।

নিচে নেমে নিকলস বললো, 'পা দুটোকে এবার একটু বিশ্রাম দাও,' ঘুরে ওদের সামনে চলে এলো সে। 'তোমরা জানো, কোথায় রয়েছো?'

'লেকচার মারতে হবে না,' খেঁকিয়ে উঠলো সলোমন। 'আমাকে নিয়ে কি করতে চাও বলো তাড়াতাড়ি।'

'কেন, কোথাও যাবার তাড়া আছে নাকি?' হাসতে লাগলো নিকলস। 'লাশ নিয়ে কারবার আমার, তারা কোথাও যেতে

পারে না,' দেয়ালের একটা সুইচের দিকে হাত বাড়ালো সে। আচমকা একটা যান্ত্রিক গর্জন শোনা গেল, জোরে টান দিয়ে স্টীল ডোর-গুলোর একটা খুলে ফেললো নিকলস। ভেতরে দাউ দাউ আগুন দেখা গেল, চারদিকের ইঁটের গাঁথুনি থেকে হিসহিস শব্দে লকলকিয়ে উঠলো নীলচে শিখা। খোলা দরজার মুখেই আর্মা-রড গ্লাসের আবরণ।

'দশ মিনিট,' বললো নিকলস। 'তার বেশি লাগবে না। তার পর থাকবে শুধু এক মুঠো ছাই।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে সলোমনের গায়ে ঢলে পড়লো রোয়েনা, বাধ্য হয়ে তাকে ধরে ফেলতে হলো। ওদেরকে মাঝখানে রেখে ঘুরছে নিকলস, চেহারায় নগ্ন উল্লাস। সিঁড়ির দিকে পিঠ দিয়ে থামলো সে। 'একেই আমরা ফুল ট্রিটমেন্ট বলি। অন্যদের কাছ থেকে পাঁচশো পাউণ্ড করে নিই, তোমরা পাচ্ছো বিনা পয়সায়।'

রোয়েনা সিধে হয় দাঁড়াতে পারছে না দেখে ঠেলা দিলো সলোমন, হাঁটু ভেঙে মেঝেতে পড়ে গেল সে। 'কোথাও ভুল হয়েছে তোমার,' নিকলসকে বললো সলোমন। 'আমি ব্যাবি-লনে যাবো, কাউন্টের সাথে আমার একটা চুক্তি হয়েছে।'

সলোমনের দিকে একটা আঙুল তাক করলো নিকলস। 'বোকা নাকি!'

'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো,' আবেদনের সুরে বললো সলোমন। 'কাউন্টকে আমি আমার টাকার হদিশ বলে দিয়েছি। চুক্তিমতো···।'

'হুম, এরকম হয়,' সবজান্তার মতো মাথা ঝাঁকালো নিকলস।

'কোনো কোনো লাশ বেঁকে বসে,' খোলা স্টীল দরজা দিয়ে গনগনে আগুনের দিকে তাকালো সে। 'কোনো কোনোটা তো ওখানে গিয়ে রীতিমতো নৃত্য শুরু করে দেয়।'

পরমুহূর্তে নিকলসের ঘাড়ে ভূত সওয়ার হলো। সিঁড়ি দিয়ে নামেনি, রেইল টপকে ঝাঁপ দিয়েছে রানা। কাঁধে রানাকে নিয়ে বসে পড়লো নিকলস, সাবলীল ভঙ্গিতে তার ঘাড় থেকে নেমে দু'পা সামনে হেঁটে গেল রানা, ছিটকে পড়া পিস্তলটা তুলে ঘুরে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে হুংকার ছেড়ে পা তুলেছে সলোমন নিকলসের পাঁজর লক্ষ্য করে।

'রক্তখেকো ছারপোকা!' নিকলসের মুখে, পাঁজরে, পেটে, যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই লাথি মারছে সলোমন। 'ডাই-নুর মাথার উকুন! তোর মাকে আমি···।'

দু'জনের মাঝখানে চলে এলো রানা, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো সলোমনকে। 'মুখ খারাপ করো না তো! সরো, ওর সাথে কথা বলতে দাও আমাকে।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে, চোখ রাঙিয়ে রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'নিজের সময় মতো এলে, তাই না?'

কথাটা গায়ে মাখলো না রানা। নিকলসকে ধরে দাঁড় করালো ও, ঠেলে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসালো। নিকলস মার খেয়ে ঘোরের মধ্যে রয়েছে, যান্ত্রিক ভঙ্গিতে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের রক্ত মুছলো সে।

'আমার নাম নাহিদ শাহ, আমার সাথে ও জো সলোমন,' হাতের পিস্তল নেড়ে বললো রানা। 'তুমি সম্ভবত জানো আমরা

কে।'

মাথা ঝাঁকালো নিকলস। 'ম্যানিংহ্যাম হাসপাতাল থেকে কাল পালিয়েছো তোমরা। কাগজে পড়েছি আমি।'

'আমরা আসবো তুমি জানতে?'

নিকলসকে ইতস্তত করতে দেখে ঘুসি বাগিয়ে এক পা সামনে বাড়লো সলোমন। 'আমার সাথে কথা বলতে দাও।'

কুঁকড়ে চেয়ারের পিছনে সরে গেল নিকলস। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মুখের সামনে একটা হাত তুললো। 'ঝামেলা করার কোনো দরকার নেই। আপনারা যা জানতে চান সব আমি বলবো।'

সলোমনের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ঠিক আছে, একটা সুযোগ দাও ওকে।' প্রশ্নটা আবার করলো ও, 'আমরা আসবো তুমি জানতে?'

মাথা ঝাঁকালো নিকলস। 'আজ বিকেলে আমি একটা ফোন পাই। কেউ আসবে জানতাম, কিন্তু আপনারা দু'জন কিনা জানতাম না।'

'কে তোমাকে ফোন করে?'

'সে নিজের নাম বলে জনি। এর বেশি তার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'চেহারার বর্ণনা দাও।'

'সুদর্শন, মার্জিত আচরণ,' কাঁধ ঝাঁকালো নিকলস। 'দেখে মনে হবে অভিজাত।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালো সলোমন। 'ডাক্তার

টেনিসন ?'

'ওরফে জনি। হ্যাঁ, তার মতোই শোনাচ্ছে বটে,' আবার রানা নিকলসের দিকে ফিরলো। 'সে আসবে কিনা জানো ?'

'পরিষ্কার করে কিছু বলেনি।'

আভনগুলো দেখার জন্যে সরে গিয়েছিল সলোমন, ফিরে এসে জানতে চাইলো, 'জনি যাদের পাঠায়, তাদের সবাইকে ফুল ট্রিটমেন্ট দাও তুমি ?'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লো নিকলস। 'ওদের বেশিরভাগকে ট্রিটমেন্ট দিতে হয় আমার। বাকিদের পাঠিয়ে দিই আরেক স্টেশনে।'

নিখাদ আতংকে সলোমনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। 'বেশিরভাগকে!' রানার দিকে ফিরলো সে। 'ফর গডস সেক, খোশ-গল্প বাদ দিয়ে যা জানার তাড়াতাড়ি জেনে নাও। এখানে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নাই। বেজন্মা কুকুরটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'বাকিদের কোথায় তুমি পাঠিয়েছো ?' নিকলসকে জিজ্ঞেস করলো রানা। 'পরবর্তী স্টেশনটা কোথায় ?'

'আমি কোনো ঠিকানা জানি না,' ইতস্তত না করেই বললো নিকলস। 'এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আসি। সাধারণত প্রতিবার একটা ভ্যান এসে তুলে নিয়ে যায় ওদের।'

'তারমানে আড়াল থেকে দেখেছো তুমি।'

মাথা ঝাঁকালো নিকলস। 'কিন্তু পিছু নিইনি। ভ্যানের

রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখেছি, তারপর আমার এক বন্ধুকে দিয়ে নম্বরটা চেক করিয়েছি। গাড়িটা গুডউইন নামে এক লোকের। তার ছোট্ট একটা বোর্ডিংয়ার্ড আছে।'

'কোথায়?'

'ডোরসেট কোস্টে, লুলওয়ার্থের কাছে, জায়গাটার নাম আপটন মাগনা। এখান থেকে প্রায় নব্বুই মাইল দূরে।'

উত্তেজিতভাবে রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'মনে হচ্ছে এই ঠিকানাটাই আমরা খুঁজছি, নাহিদ। রাস্তার ওটা শেষ মাথা হতে পারে।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নিকলসের দিকে। আচমকা লোকটার মাথায় পিস্তলের মাজ্‌ল্ ঠেকিয়ে হ্যামার কক করলো ও। 'শালা মিথ্যুক!'

আতংকে নীল হয়ে গেল নিকলস, তোতলাতে শুরু করলো, 'স-সত্যি, স-সত্যি। মা-মায়ের কি-রে!'

আক্রোশে দাঁত চাপলো সলোমন। 'তোর তো মা-ই ছিলো না, বানচোত।' বলেই চেয়ারটার পায়ায় পা বাধিয়ে টান দিলো, ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল নিকলস।

মেঝেতে পড়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো সে, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'তুমি চাও, সলোমনের হাতে তুলে দিই তোমাকে?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো নিকলস। উঠে বসলো সে, বললো, 'যা বলবেন···।'

'রিড কোয়েন, জন হেরিক, আর রিপ হটন—এদের সম্পর্কে

কি জানো তুমি ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'রিড কোয়েন ? জন হেরিক ?' মাথা নাড়লো নিকলস। 'এদের কথা জানি না। তবে রিপ হুটনকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল।'

'কোথায় সে ?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আমার চোদ্দপুরুষের কিরে, তাকে আমি রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'তারপর ? সেই একই ভ্যান তাকে তুলে নিয়ে যায় ?'

'তাই নিয়ে যাবার কথা, কিন্তু দেখার জন্যে আমি সেখানে ছিলাম না।'

নিকলসের দিকে আরো ক'সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো রানা। লোকটার একটা বিহিত করা দরকার, কিন্তু হাতে এই মুহূর্তে আরো জরুরী কাজ রয়েছে। পরে।

পিস্তলটা পকেটে ভরে রোয়েনার দিকে ফিরলো রানা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে মেয়েটা। তার একটা হাত ধরলো ও, বললো, 'চলো, বেরোনো যাক।'

'মড়াখেকোটার কি হবে ?' নিকলসের পাঁজরে পায়ের খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'ওর কোনো ক্ষমতাই নেই আমাদের ক্ষতি করে,' বললো রানা। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি তা যদি বলে দেয়, ওরা জানতে চাইবে ঠিকানাটা আমরা পেলাম কোথায়। তারপর কতোক্ষণ বাঁচবে বলে তোমার ধারণা ?'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো নিকলস, কথা-

টার তাৎপর্য উপলব্ধি করে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। তার ভাব দেখে কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো সলোমন।

'তোমার বুদ্ধিকে নমস্কার, নাহিদ। তবে আমার ধারণা ওর খানিকটা বিশ্রাম দরকার,' ছুটে গিয়ে নিকলসের মাথার পাশে লাথি মারলো সলোমন।

মেঝের ওপর গড়ান খেলো নিকলস, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগলো। অস্পষ্টভাবে দেখলো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে তিনজনের দলটা। তারপর জ্ঞান হারালো সে।

সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যথাটা। গভীর অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসতে শুরু করলো নিকলস। কে যেন তার গালে বার-বার চড় মারছে, নাম ধরে ডাকছে। চোখ মেলে রবার্ট পিয়ারসন ওরফে টেনিসন ওরফে জনির মুখটা চোখের সামনে ভাসতে দেখলো সে।

'তোমার চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে, বুড়ো খোকা। সম্ভবত এসে আবার চলে গেছে ওরা, তাই না?'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করলো নিকলস। 'তিনজন ছিলো ওরা,' ঘড়ঘড় করে উঠলো তার কণ্ঠস্বর। 'তোমার কথা-মতো দু'জন নয়। সাথে একটা মেয়েও ছিলো।'

'ও, খোঁজ তাহলে পাওয়া গেল। প্রিয় জনি, ভুল-ভাল তোমারও দেখি হচ্ছে! দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, গাড়িটা বিগড়ে গিয়েছিল পথে, পৌঁছুতে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল।' নিকলসকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো সে, বসিয়ে দিলো চেয়ারে। 'কতোক্ষণ

হয় গেছে ওরা ?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিকলস দেখলো প্রায় সাতটা বাজে। 'আধ ঘণ্টা, তার বেশিও হতে পারে।'

'হুঁ। কোথায় যেতে হবে তুমি ওদের বলেছো, তাই না ? গুডউইনের বোটইয়ার্ড, আপটন মাগনা ?' তাকিয়ে থাকলো নিকলস, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না, মাথায় দপ দপে ব্যথাটা চিন্তা শক্তি ভোঁতা করে দিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেললো জনি। 'কাজটা তুমি ভালো করোনি হে।'

'আমার আর কোনো উপায় ছিলো না,' ক্লান্তস্বরে বললো নিকলস। 'না বললে ওরা আমাকে খুন করতো। এখনো সময় আছে, ইচ্ছে করলে ওদের তুমি ধরতে পারো।'

'ধরতে যে পারি সে আমার জানা,' বললো জনি। 'দুটো বিশেষ সুবিধে আছে আমার। নতুন একটা গাড়ি, বলতে পারো পক্ষীরাজ। আর, ঠিকানাটা আমার চেনা। ওদের অসুবিধে হলো, অলিগলি ধরে যেতে হবে, চেক করতে হবে প্রতিটা সাইনপোস্ট—তাছাড়া, ডোরসেট এলাকাটা এক রকম গোলক-ধাঁধা বলতে পারো। বিশেষ করে রাতে।' জনি পিছন দিকে সরে যেতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো নিকলস। 'তোমাকে নিয়ে অসুবিধেটা কি জানো, বুড়ো খোকা ? তোমার ধারণা তুমি খুব বুদ্ধি রাখো, আসলে তা নয়—হয়তো চতুর, কিন্তু বুদ্ধিমান নও। বিশ্বাস করো, কাজটা করে আমি কোনো তৃপ্তি পাবো না। বলতে পারো, তিক্ত কর্তব্য পালন করছি।'

নিকলসের খুলির গোড়ায় ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড এক রদ্দা

মারলো জনি। ছোট্ট একটা কায়ার আওয়াজ বেরুলো কি বেরুলো না, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো নিকলস। তাকে পাঁজাকোলা করে বুকে তুলে নিলো জনি।

খোলা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সুইচ অফ করলো সে। ভেতরে আগুন নিভে গেল। কাঁচের দরজা খুলতেই সাত ফুট লম্বা বেস প্লেট পিছলে বেরিয়ে এলো বাইরে। নিকলসকে তাতে শুইয়ে দিলো জনি, হাত দুটো শরীরের পাশে সিধে করে দিলো। তারপর ঠেলা দিয়ে প্লেটটা আবার ঢোকালো ভেতরে, বন্ধ করলো কাঁচের দরজা।

সিগারেট ধরাবার জন্যে থামলো জনি, তারপর অন করলো সুইচ। দাউ দাউ অগ্নিশিখা চারদিক থেকে উদবাহু নৃত্য শুরু করে দিলো, অন্ধকার থেকে লাফ দিয়ে সেই আগুনের মাঝখানে উঠে এলো নিকলস। চোখের পলকে আগুন তাকে গ্রাস করলো। এক সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত কাপড়চোড় গায়েব। তারপর, অবিশ্বাস্য বটে, নিকলসের একটা হাত বগলের কাছ থেকে খাড়া হয়ে গেল। যেন জ্বলন্ত একটা মশাল। শরীরটা নড়ে উঠলো, সেই সাথে মশালটাও।

চোখে-মুখে গভীর আগ্রহ নিয়ে দু'মিনিট দৃশ্যটা উপভোগ করলো জনি। তারপর স্টীল ডোর বন্ধ করে দিলো। ডায়ালের কাঁটা ঘুরিয়ে ম্যাক্সিমামে রাখলো সে, সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল ওপরে।

গ্লস্টারের উল্টোদিকে, এক মাইল এগিয়ে একটা ফোন বক্সে

ঢুকলো সে। ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের নাম্বারে ডায়াল করলো।

'হ্যালো, সুইটি। বলতে খারাপ লাগছে, ব্যাপারটার সুরাহা হয়নি এখনও। বন্ধুরা ডোরসেটের পথে রয়েছে।'

নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'দুঃখজনক। কি করবে ভেবেছো কিছু?'

'এখন থেকে গোটা ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে হবে। চেষ্টা করবো ওরা যাতে বাহনটা পায়, বরাবর সবাই যেটা ব্যবহার করে। যাক ওরা রওনা হয়ে। এমন কলকাটি নেড়ে রাখবো, তীরে আর ভিড়তে হবে না।'

'খুব বেশি দূর যেতে দেয়া হয়ে যাচ্ছে না?'

'কি করে? বোট যদি মাঝপথে ডুব দেয়?'

'যা ভালো বোঝো করো। মেসেজটা আমি জায়গা মতো পৌঁছে দিচ্ছি।'

'সেই সাথে আমার হয়ে মহামান্যকে একটু বলো, বুড়ি খুকি, ব্যক্তিগতভাবে রিপোর্ট করার জন্যে আরেকটা বোটে আসছি আমি। ব্রেকফাস্টের সময় ওখানে আমাকে পাওয়া যাবে।'

'বলবো তাঁকে।'

লাইন কেটে গেল, শিস দিতে দিতে গাড়িতে ফিরে এলো জনি।

সাত

আপটন মাগনা জেলেদের একটা গ্রাম, এককালে সুখ্যাতি এবং গুরুত্ব থাকলেও, কমতে কমতে লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুশোর মতো, ক্ষুদে হারবারে খুব বেশি হলে দু'চারটে বোট দেখা যায়।

পচন ধরা বাঁশের স্তূপ, নড়বড়ে কাঠের ঘর, পানি থেকে তোলা ভগ্নদশা কয়েকটা বোট, আর একটা পাথুরে জেটি নিয়ে গুডউইনের বোটইয়ার্ড। বোটগুলোকে দেখে কেউ বলবে না ওগুলো আবার পানিতে নামবে কোনোদিন।

ঠিক সাড়ে ন'টার সময় গ্রামে ঢুকলো জনি, গাড়ি নিয়ে মেইন রোড ধরে এগোলো সে। খানিক সামনে চুনকাম করা একটা পাবলিক হাউস পড়লো, পিছনে গাড়ি রাখার জায়গা। গাঢ় ছায়ায় স্পোর্টস কার-টা রেখে পায়ে হেঁটে এগোলো জনি।

বাড়িটার সদর দরজার ডানদিকে একটা জানালা, ভেতরে আলো জ্বলছে। দরজার পাশেই সাইনবোর্ড—রবার্ট গুডউইন—বোটবিল্ডার—ইয়টস ফর হায়ার। তিনটে ধাপ টপকে পোর্চে

উঠলো জনি, জানালা দিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে।

কামরার অর্ধেকটা দখল করে আছে টেবিল-চেয়ার, বাকি অর্ধেকটা বিছানা-পত্র। সমস্ত জিনিস এলোমেলো হয়ে আছে। কাঠের রিসেপশন ডেস্কের পিছনে ছোটো একটা টেবিল, তার ওপাশে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে গুডউইন। টেবিলের ওপর এঁটো বাসনকোসন ছড়িয়ে রয়েছে, বোধহয় পুরো হপ্তা ওগুলোয় কারো হাত পড়েনি।

গুডউইনের বয়স হবে ষাটের মতো, এতো বেশি মোটা যে হাসি পায়। সারা গায়ে বনমানুষের মতো লম্বা লম্বা চুল। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো লোকটা, এবং অবাক হয়ে জনি দেখলো, একজোড়া ক্রাচ টেনে নিয়ে বগলের নিচে গুঁজে দিলো সে। টেবিল থেকে এনামেলের একটা মগ নিলো, ক্রাচে ভর দিয়ে এগোলো স্টোভের দিকে। স্টোভে কফি পট বসানো রয়েছে। তার ডান পা-টা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঝুলে থাকলো মেঝের ওপর।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো জনি। বিস্মিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো গুডউইন, এক হাতে মগ, আরেক হাতে কফি পট। 'আপনি, মিঃ জনি! আপনাকে আমি আশা করিনি!'

'পায়ে কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো জনি।

কাঁধ ঝাঁকালো গুডউইন। 'কি আর বলবো, কপাল মন্দ। কাল রাতে ইয়ার্ড থেকে ফেরার সময় লোহার স্তূপে ঠোকর খেয়ে পড়ে যাই।'

'বরাবরের মতো গলা পর্যন্ত মদ গিলেছিলে। কতোটা খারাপ?'

'এক জোড়া হাড় ভেঙে গেছে।'

'খুব ভালো! আমার প্ল্যানের জন্যে দারুণ সুবিধে হলো।' গোল্ডেন সানের খবর কি? পানিতে নামানো যাবে?'

'আপনার হুকুম মতো ওটাকে আমি সব সময় তৈরি রাখি, মিঃ জনি। এবার কি আপনি পাড়ি দেবেন?'

বেঢপ আকৃতি, লাল চোখ, চোখের নিচে পুঁটুলি, ফোলা গালে জেগে থাকা আঁকাবাঁকা শিরা, ইত্যাদি দেখেই বলে দেয়া যায় লোকটা কুঁড়ের বাদশা, ব্যর্থতার সীল-ছাপ্পড় মারা জীবন। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শন আগন্তুককে খুশি করার একটা ব্যাকুল আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল তার মধ্যে। একমাত্র কারণ, এই আগন্তুকের কল্যাণে আজও একেবারে দেউলিয়া হয়নি সে।

'আমি না,' বললো জনি। 'তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছোটোখাটো একটা দল আসছে। দু'জন পুরুষ, একটা মেয়ে। সেই একই পাসওয়ার্ড আওড়াবে। ওরা চাইবে তুমি ওদের পার করে দেবে।'

গুডউইনকে সন্দিহান দেখালো। 'হুকুম মানতে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু এই পা নিয়ে···মানে···।'

'বললাম না, তুমি পা ভাঙায় আমার খুব সুবিধে হলো? যেতে না চাওয়ার জন্যে ওই পা একটা অজুহাত হিশেবে কাজ করবে। ওরা এলে ব্যথায় কাতরাবে তুমি, ব্যথা হোক বা না হোক। ওদের অন্তত একজন বোট সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বুঝলে? এম. টি. বি-তে ছিলো, প্রাক্তন পেটি অফিসার। প্রয়োজনে তোমার গোল্ডেন সান নিয়ে দুনিয়াটা একবার চক্কর দিয়ে আসতে

পারবে সে।'

'তারমানে আপনি সত্যি চান লোকগুলো নিজেরাই বোট নিয়ে রওনা হোক?'

'এতোক্ষণে বুঝেছো। পথ আর গন্তব্য জানতে চাইবে ওরা, দুটোই জানিয়ে দেবে তুমি,' মিটিমিটি হাসিটা জনির সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো, শুধু চোখ বাদে। 'আরে না, অবশ্যই তারা ওখানে পৌঁছুবে না। তবে আশায় বুক বেঁধে খানিকটা পথ দিক না পাড়ি, ক্ষতি কি?'

'আর আপনি?'

'তোমার যতোটুকু জানা আছে, আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। ব্যবস্থা ইত্যাদি করার জন্যে গোল্ডেন সানে যাচ্ছি আমি। তীর ধরে ফিরে আসবো। বলা যায় না, সময়ের আগে পৌঁছে যেতে পারে ওরা,' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলো জনি। দশ পাউণ্ডের বিশটা নোট রাখলো টেবিলে। 'বাকি অর্ধেক কাজ হলে, ঠিক আছে, বুড়ো খোকা?'

টাকাগুলো তাড়াতাড়ি পকেট ভরে ফেললো গুডউইন। 'একশো বার ঠিক আছে, মিঃ জনি। ধন্যবাদ, মিঃ জনি। আপনি যেভাবে বললেন ঠিক সেভাবেই সব কাজ হবে।'

'তা না হলে চলবে কেন,' বলে ঘুরে দাঁড়ালো জনি, তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ক্রাচে ভর দিয়ে সিঙ্কের পাশে কাবার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো গুডউইন, কবাট খুলে ভেতর থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করলো। আলোর সামনে ধরে দেখলো বোতলে ইঞ্চি

দেড়েক ছইস্কি রয়েছে। বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিলো সে। যে-টুকু আছে এক ঢোকে গিলে ফেলে বোতলটা ছুঁড়ে দিলো এক কোণে। টেবিলে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। আসুক ওরা।

পাথুরে জেটির কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো জনি, লাফ দিয়ে পড়লো গোল্ডেন সানের ডেকে। জেটির মাথায় নগ্ন একটা বালব থেকে হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে, পিচ্ছিল হয়ে আছে ভিজে ডেক, সাবধানে পা ফেলে এগোলো সে। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নামার সময় ব্যস্ত হাতে খুলে ফেললো রেইনকোটটা। সময় কম, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

প্যাড লাগানো বেঞ্চের তলায় হাত গলিয়ে একটা লকার খুললো সে, ভেতর থেকে অ্যাকুয়ালাং সহ কয়েকটা স্কিন-ডাইভিং ইকুইপমেন্ট বের করে সেন্টার টেবিলে রাখলো।

এরপর ডেকে হাঁটু গেড়ে নিচু হলো জনি, খালি লকারের পিছনের দেয়াল হাতড়ে বোতাম টিপে দিতেই ক্লিক করে আওয়াজের সাথে খুলে গেল একটা গোপন কম্পার্টমেন্ট। ভেতরে খড় ভর্তি বাক্সে একটা স্টার্লিং সাব-মেশিন গান, দুটো অটোমেটিক রাইফেল, কয়েকটা গ্রেনেড, আর ছ'টা লিমপেট মাইন রয়েছে।

একটা মাইন বের করে চেক করলো জনি। হাত ঘড়িতে সময় দেখলো, দশটা বাজতে চলেছে। মাইনের টাইম সুইচটা পুরো এক পাক করে মোট চারবার ঘোরালো সে। তারপর আণ্ডার-অয়্যার বাদে বাকি সব কাপড়চোপড় খুলে ফেললো। অ্যাকুয়ালাং

পরে বেরিয়ে এলো ডেকে।

এক হাতে বুকের কাছে লিমপেট মাইন ধরে রেইল টপকে পানিতে নামলো জনি। কনকনে ঠাণ্ডা পানি, কিন্তু গ্রাহ্য না করে পানির তলা দিয়ে বোটের পিছন দিকে এগোলো সে।

জেটির নগ্ন বালব থেকে খুব কম আলো নামছে পানির তলায়, তবু ঝাপসাভাবে হলেও হাত দুটো দেখতে পেলো জনি। প্রপেলারের কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে নিয়েছে সে। লিমপেট মাইনের শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেট ইস্পাতের খোলে শক্তভাবে আটকে গেছে। মাস্কের ভেতর মিটিমিটি হাসি দেখা দিল জনির মুখে। কাজটা শেষ করে সন্তুষ্ট বোধ করলো সে।

ডেক পেরিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে যাবার সময় একটা আওয়াজ শুনে থমকে গেল জনি। বাঁক নিয়ে ইয়ার্ডের দিকে ঘুরলো একটা ভ্যান, কাঠের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। আলো নিভলো, বন্ধ হলো ইঞ্জিন। আর কিছু দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো না জনি, তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো সেলুনে।

স্কিন-ডাইভিং ইকুইপমেন্ট লকারে তুলে রাখলো সে, ব্যস্ত হাতে কাপড় পরলো, গায়ে রেনকোট চড়াতে চড়াতে বেরিয়ে এলো ডেকে। শুনতে পেলো, জেটি ধরে কারা যেন এগিয়ে আসছে। রেইল টপকে লাফ দিলো সে, তীরে উঠে অন্ধকারে মিশে গেল।

ফোর্ডের ইঞ্জিন বন্ধ করার পর নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মতো

বাজলো রানার কানে। চারদিকে অন্ধকার, ছাদের ওপর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। 'রাস্তার শেষ মাথা?' অনেকটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো ও।

'দেখে মনে হচ্ছে ঈশ্বর জায়গাটার কথা ভুলে গেছে,' মন্তব্য করলো সলোমন। ঠিক তখনই আলোকিত জানালার পাশে খুলে গেল দরজা, ক্রাচে ভর দিয়ে পোর্চে বেরিয়ে এলো গুডউইন।

'কে ওখানে?'

গাড়ি থেকে নেমে সামনে বাড়লো রানা, পাশে থাকলো সলোমন, দু'পা পিছনে রোয়েনা। ধাপের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো ছোট্ট দলটা। 'আমরা ব্যবিলনে পৌঁছুবার চেষ্টা করছি,' বললো রানা। 'শুনলাম আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো গুডউইন। ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে থাকলো। কে এই সুদর্শন যুবক? কি তার অপরাধ? প্রশ্নগুলো তাকে বিচলিত করে তোলার আগেই ঝেড়ে ফেললো মন থেকে। এতোসব জেনে আমার কি লাভ? জনি আমাকে টাকা দেয়, জনি আমার দ্বিতীয় ঈশ্বর। ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো সে। 'আপনারা বরং ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলো গুডউইন, স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো বড় করে। ভেজা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। চোখে কৌতূহল নিয়ে একে একে তিনজনের দিকে তাকালো। বাকি দু'জন কে? প্রথমজনের সাথে কোনো মিল নেই ওদের।

'আমি কোনো খবর পাইনি,' বললো সে। 'কারো আসার কথা থাকলে ওরা আমাকে বেশ কিছুক্ষণ আগে জানায়।'

'আমরা স্পেশাল,' বললো রানা। 'আপনাকে জানাবার সময় হয়নি।'

চেহারায় সন্দেহ ফুটিয়ে তুলে কাঁধ ঝাঁকালো গুডউইন। 'কি জানি। বোট অবশ্য তৈরি হয়ে আছে—বরাবর তাই থাকে। কিন্তু আপনারা···ঠিক বুঝতে পারছি না। এদিকে কাল রাতে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছি, হাঁটাচলা করতেই জান বেরিয়ে যাচ্ছে, লষ পিয়েরে-তে যেতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'লষ পিয়েরে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কোথায় সেটা?'

'অ্যালডারনে-র বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এ,' বলে উঠলো সলোমন। তার দিকে অবাক হয়ে তাকালো রানা। 'তুমি ভুলে যাচ্ছো, নাহিদ। নেভী থেকে বেরিয়ে এসে চ্যানেলেই তো ব্যবসা করতাম আমি। নিজের হাতের রেখাগুলোর মতোই সমস্তটা চিনি আমি।'

'উনি ঠিক বলেছেন,' বললো গুডউইন। 'জায়গা তেমন কিছু না। মাইলখানেক লম্বা, এক দিকে পাহাড়ের পাঁচিল তিন চার শো ফিট উঁচু। একটাই সম্ভাব্য অ্যাংকোরেজ, দ্বীপের দক্ষিণ দিকে। পুরনো একটা জেটি আছে। ব্যস, আর কিচ্ছু না।'

'তোমাকে টাকা দেয় কে?'

'জনি নামে এক লোক। দু'তিন মাসে এক-আধবার আসে, বেশিরভাগ সময় কথা হয় টেলিফোনে।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে দরজার দিকে তাকালো সে। 'আশ্চর্য, আপনাদের ব্যাপারটা

আমাকে সে জানালো না কেন!'

'জানাবে,' বললো সলোমন। 'আর, তোমার টাকাও তুমি পেয়ে যাবে। কথা দিচ্ছি। বোটটা কি ধরনের?'

'মটর ক্রুজার—গোল্ডেন সান। ত্রিশ ফুটি, একেরবুন তৈরি করেছে। টুইন স্ক্রু, স্টীল হাল।'

চেহারায় প্রশংসার ভাব নিয়ে সলোমন বললো, 'বোট বটে একখানা! পাওয়ার?'

'পেনটা পেট্রল ইঞ্জিন। ম্যাক্সিমাম টোয়েনটি-টু নট স্পীড। তবে, আজ রাতে নয়। আবহাওয়া তেমন সুবিধের মনে করি না।'

'রিপোর্ট কি বলে?'

'উইণ্ড ফোর্স থ্রি টু ফোর। ঝমঝম বৃষ্টি। সকালে কুয়াশা।'

'কোনো ব্যাপারই নয়।'

সলোমনের দিকে তাকালো রানা। 'সামলাতে পারবে তো?'

'কি বলছো! ওটা নিয়ে আমি আটলান্টিক পাড়ি দিতে পারি।'

'কাজটা ভারি কঠিন হবে, মিস্টার,' মাঝখান থেকে বললো গুডউইন। 'ওটার রেঞ্জ মাত্র ছয়শো মাইল, রিজার্ভ ট্যাংকস।'

নিঃশব্দে হাসলো সলোমন। 'যথেষ্ট, তারপরও দু'চারটে দ্বীপে ঢুঁ মারা যাবে। তুমি একেবারে ঝামেলা মুক্ত হয়ে গেলে। ঘরে বসে পায়ের যত্ন নাও।'

ইতস্তত করতে লাগলো গুডউইন। 'কি করবো বুঝতে পারছি না! বোটটা তো আমার নয়, মিঃ জনির।'

হাত বাড়িয়ে গুডউইনের কাঁধ খামচে ধরলো সলোমন, ঝুঁকে শ্বাস টানতেই হুইস্কির গন্ধ পেলো সে। গুডউইনকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে হোফার টুইডের মানিব্যাগটা বের করলো। পাঁচ পাউণ্ডের দুটো নোট টেবিলে রেখে বললো, 'আসার সময় রাস্তার ধারে একটা পাব দেখলাম। বাজি রেখে বলতে পারি, চেষ্টা করলে এই পা নিয়েও ওখানে তুমি পৌঁছতে পারবে।'

টাকাগুলো হাতে নিয়ে ইতস্তত করতে লাগলো গুডউইন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে ভরলো। 'ঈশ্বর জানেন, কোনো বিকল্প নেই,' দেরাজ খুলে ভেতর থেকে এক কপি চ্যানেল পাইলট বের করলো সে। 'আপনাদের পথে তিনটে আলো পাবেন, এক লাইনে রেখে এগোলে পথ ভুল হবে না।'

বইটা তুলে নিয়ে রানার দিকে ফিরলো সলোমন। 'আমরা অপেক্ষা করছি কেন?'

ওদের পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, কেঁপে উঠলো কাঠের ঘর। চেয়ারে বসে সিলিঙের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো গুডউইন, তার মুখটাকে মাঝখানে রেখে একটা নীল মাছি ভন ভন করে উড়ে বেড়াতে লাগলো। খানিক পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, পকেট থেকে একগাদা টাকা বের করে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সেগুলোর দিকে। ধীরে ধীরে দাঁড়ালো সে, ক্রাচে ভর দিয়ে দরজার দিকে এগোলো। এক ঢোক মদ খাওয়া দরকার, কিংবা এক বোতল। অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে ওদের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে জানে সে। ভুলে থাকার চেষ্টা করতে হবে। শুধু ওদেরকে নয়, মিঃ জনিকেও।

আট

জেটির মাথায় গোল্ডেন সানের বো দুলছে। লম্বা, ঢালু ডেক হাউসের দিকে তাকিয়ে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল সলোমনের মনে। নতুন খেলনা পাওয়া শিশুর মতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে। 'মাই গড, আমার তর সইছে না! এরকম একটা বোট পেলে আর চাই কি!'

মাথা নাড়লো রানা। 'ব্যাপারটা খুব সহজে মিটে গেল।'

'মানে? কিসের কথা বলছো তুমি?'

'বাধা তো দিলোই না, বরং আমাদের সাহায্য করলো গুড-উইন। মেলে না, সলোমন। আমি বরং একবার দেখে আসি মাতাল বনমানুষটা কি করছে।'

'তোমার খুশি,' বললো সলোমন। 'আমি কিন্তু নোঙর তোলার জন্যে তৈরি হচ্ছি। দশ মিনিট, তার বেশি দেরি করলে আমাকে পাবে না।'

রানা জানে, সলোমন তাই করবে, তবু তর্ক করে সময় নষ্ট

করলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলো, অন্ধকার বোটইয়ার্ডের দিকে হারিয়ে গেল।

পরিষ্কারভাবে কিছু ধরতে না পারলেও, গুডউইনের ইতস্তত আচরণ রানার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। কথাগুলো যেন মুখস্থ বলে গেছে লোকটা।

গুডউইনের উদ্দেশ্য কি জানা দরকার, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ উইলিয়াম ম্যানফ্রেডের সাথে যোগাযোগ করা। দ্বীপে পৌঁছুবার পর প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিপদকে ভয় পায় না ও, কিন্তু বিপদ কাটাবার জন্যে আগে থেকে সাবধান না হওয়াটা মস্ত বোকামি হবে। সম্ভবত রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে ওরা। পেলে এখানেই পাওয়া যাবে হাসানের খবর। হয়তো কাউন্টের সাথেও দেখা হবে।

ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে এগোলো রানা, তারপর অন্ধকার ছায়ায় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটু পর নিচু ঝোপের আড়ালে বসে পড়লো ও, ক্রাচে ভর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে গুডউইন।

মাথা নিচু করে হাঁটছে লোকটা। রানাকে পাশ কাটিয়ে গেল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিলো রানা। গ্রামে একটা মাত্র পাব, ভেতরে ঢুকে গেল গুডউইন। রানা থামলো না, মোড় পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ঢুকলো টেলিফোন বক্সে।

রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার ডায়াল করতেই সাড়া পাওয়া গেল সোহানার। মাত্র দু'চার্‌টে কথা হলো।

'তুমি ভালো ?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো সোহানা।

'আছি। হটলাইন ?'

'রেডি। কথা বলো।'

তারপরই উইলিয়াম ম্যানক্রেডের গলা পেলো রানা। 'মিঃ রানা ? কোথায় আপনি ?'

'আপটন মাগনা—লুলওয়ার্থ-এর কাছে ছোটো একটা ফিশিং পোর্ট। টেপ রেকর্ডার অন করুন। এখুনি আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি, যাবো লম্ব পিয়েরে নামে একটা দ্বীপে। অ্যালডারনে থেকে বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, চ্যানেল আইল্যাণ্ডস-এ। জায়গাটা সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানতে চাই, তিন মিনিটের মধ্যে।'

'কমপিউটরের সাথে এরইমধ্যে কানেকশন দেয়া হয়েছে,' বি. এস. এস. চীফ বললেন। 'উত্তর আসার আগে আর কি বলবেন, বলুন।'

'ওয়াইকেহেড ফার্ম, ওর্কশায়ার-এর কাছে সেট্‌ল-এ হোফার টুইড নামে এক লোক আছে। আল্লাই জানে ওখানে কতো লোককে কুয়াটায় ফেলেছে সে। হাড়গুলো হয়তো উদ্ধার করতে পারেন। এরপর রুথ ব্ল্যানশি, বুড়ি মহিলা। শ্রুজবারি-র কাছে বাম্পটনে থাকে সে, আলমা কটেজে। বুড়ির জন্যে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু জড়িয়ে পড়া তার উচিত হয়নি।'

'আর কেউ ?'

'এড নিকলস। লং ব্যারো হাউস অভ রেস্ট নামে তার একটা ক্রেম্যাটরিয়াম আছে। গ্লস্টারের কাছে। তারপর, রবার্ট

গুডউইন। এখানে একটা বোটইয়ার্ড চালায়।'

রানা থামতেই ম্যানফ্রেড বললেন, 'আপনার ইনফরমেশন আসতে শুরু করেছে। লম্ব পিয়েরে দ্বীপটার মালিক হলো স্টেটস অভ গুয়ের্ণসি। লিজ নিয়েছে, দু'বছরের জন্যে, কাউন্ট মাভো বুয়ার্দ। দ্বীপে একটাই বাড়ি।'

'নামটা আগে কখনো শুনেছি নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'পরিচিত নাম?'

'সম্ভবত শুনেছেন। শুধু মিলিয়নস পাউণ্ডের প্রজেক্টে ফাইন্যান্স করেন ভদ্রলোক। ট্যাক্স, লাইসেন্স, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট, ইত্যাদি নিয়ে প্রায়ই ঘাপলা করেন। ফ্রড স্কোয়াড বেশ কয়েকবারই ইনভেস্টিগেশন চালিয়েছে, তবে গভীর জলের মাছ বলে নাগাল পাওয়া যায়নি। নিজে কিছুই করেন না, সমস্ত কিছু বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে চালান। শোনা যায়, পঞ্চাশজন ম্যানেজার বা সেক্রেটারী আছে তাঁর, কারো বেতন দশ হাজার পাউণ্ডের কম নয়। আরো গুজব, তারাও সবাই নাকি কাউন্ট বুয়ার্দকে দেখেনি কখনো। ভদ্রলোকের অনেক ফার্মের একটা ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট, তিনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ-সব আপনার কাজে লাগবে?'

'ওখানে না পৌঁছে বলতে পারছি না। আমার সাহায্য দরকার হতে পারে, চাওয়ার সাথে সাথে পেতে হবে। খুব ছুটতে পারে এমন এক জোড়া ন্যাভাল এম. টি. বি. হলে ভালো হয়। সম্ভব?'

'এখুনি আমি ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের সাথে কথা বলছি,'

ম্যানফ্রেড বললেন। 'আপনি যদি ওগুলোর সাথে রেডিওতে কথা বলতে চান, সাধারণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করবেন। আপনার কল সাইন হবে—টপ মোস্ট। বেস্ট অভ লাক, মিঃ রানা। থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফোন বক্স থেকে বেরিয়ে বোটইয়ার্ডের দিকে ফিরে চললো রানা। ঘরটাকে পাশ কাটিয়ে চলে এসেছে, হঠাৎ আলোকিত জানালায় একটা ছায়া পড়তে দেখে স্যাঁৎ করে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলো ও। কয়েক সেকেণ্ড পর দরজা খুলে পোর্চে বেরিয়ে এলো এক লোক। দেখেই তাকে চিনতে পারলো রানা—ডঃ টেনিসন ওরফে জনি।

রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক তাকালো জনি, আপনমনে মিটিমিটি হাসছে।

পকেট থেকে নিকলসের পিস্তলটা বের করলো রানা।

বোটইয়ার্ডের দিকে এগোলো জনি। রানাকে পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর দাঁড়ালো, কাঠির মাথায় জ্বলে উঠলো বারুদ, সিগারেট ধরিয়ে আবার হাঁটতে থাকলো সে। তার পিছনে উঠে দাঁড়ালো রানা, দ্রুত পায়ে চলে এলো পিঠের কাছে। জনির খুলির নিচে নরম মাংসে পিস্তলের মাজ্‌ল্ ঠেকালো ও। 'সেই যে রাস্তার ওপর ছেড়ে দিলে, তারপর একদম খবর নেই। কেমন আছো, জনি?' মাজ্‌ল্‌টা সরিয়ে নিলো রানা। জনি ঘুরতে যাবে, পিস্তলটা উল্টো করে তার চাঁদিতে বাড়ি মারলো ও।

পড়ে যাচ্ছিলো জনি, ধরে ফেলে ডান কাঁধে তুলে নিলো রানা। ঠিক সেই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠে রাতের নিস্তব্ধতাকে

ভেঙে খান খান করে দিলো গোল্ডেন সানের ইঞ্জিন। কাঁধে বোঝা নিয়ে অন্ধকার জেটির দিকে ছুটলো রানা।

ধাপ বেয়ে গোল্ডেন সানে নামছে রানা, নোঙর তোলা বাদ দিয়ে ছুটে এলো সলোমন, কাঁধ থেকে বোঝা নামাতে সাহায্য করলো রানাকে। 'মাইরি বলছি, আমি পাগল হয়ে যাবো!' হাত-পা ছড়িয়ে ডেকে পড়ে থাকা জনির দিকে চোখ রেখে বললো সে। 'আমাদের পুরনো দোস্ত ডাক্তার টেনিসন না?'

'নিশ্চয়ই আরো অনেক নাম আছে ওর,' বললো রানা। 'গুড-উইনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তুলে নিয়ে এলাম। ভাবলাম দ্বীপটা সম্পর্কে হয়তো কিছু বলতে পারবে।'

'আপাততঃ একটা কেবিনে রাখো,' পরামর্শ দিলো সলোমন। 'পরে কথা বলানো যাবে। আগে আমি এই জায়গা থেকে কেটে পড়তে চাই। রোয়েনা সাহায্য করবে তোমাকে।'

জনির পা ধরলো রোয়েনা, তার বগলের নিচে হাত গলিয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে চললো রানা। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে এলো নিচে। তিনটে কেবিনের একটায় ঢোকানো হলো তাকে, বাঙ্কে শুইয়ে দিয়ে দুই গোড়ালি আর দুই কব্জি এক করে বাঁধা হলো কর্ড দিয়ে।

দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুরলো রানা, রোয়েনার ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মায়া লাগলো। একের পর এক ধকল সামলে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে মেয়েটা। তার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'তোমার শরীর খারাপ লাগছে?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লো রোয়েনা। জোর করে হাসলো একটু।

'না,' মাথা নিচু করলো সে। 'মিঃ নাহিদ ?'

'কিছু বলবে ?'

'না,' বলেই ওপর নিচে মাথা দোলালো রোয়েনা। 'হ্যাঁ,' ঢোক গিললো একটা।

'এ-ধরনের অনুভূতি আমার আগে কখনো হয়নি,' নিচু গলায় বললো রোয়েনা। 'মানে, এই প্রথম ; আমার জীবনে আগে কখনো কোনো পুরুষ আসেনি।'

রানা তাকিয়ে থাকলো। কিছুই ওর বলার নেই। বললেও রোয়েনা বুঝবে না। বা শুনবে না।

'আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারছি না,' রানার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ালো মেয়েটা। 'লাশ পোড়ানোর ঘরে নিকলসকে ও কি বললো জানেন ? বললো, ওর ব্যাপারে নিকলস নাকি ভুল করছে। অথচ আমিও সেখানে ছিলাম। আমার যেন মনে হলো, শুধু নিজের জন্যে নিকলসকে অনুরোধ করছিল ও। যেন আমার ভালো-মন্দে ওর কিছু আসে যায় না। নাকি ভুল হয়েছে আমার ?'

'এখন এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়,' বললো রানা। 'বুঝতেই পারছো, বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা। তবে, আমি যতোটুকু বুঝি, সম্ভব হলে সম্পর্কটাকে হালকা করে দেখতে চেষ্টা করো। মনে রেখো, মানুষের সব আশা পূরণ হয় না।'

আহত দৃষ্টি মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো রোয়েনা।

অস্বস্তি বোধ করলো রানা। বললো, 'গ্যালিটা খুঁজে বের করতে পারবে ? আমাদের সবাইকে একটু কফি খাওয়াও না।'

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে প্যাসেজওয়ে ধরে চলে গেল মেয়েটা। স্তম্ভিতভাবে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা। কে জানে কি আছে মেয়েটার ভাগ্যে। ঘটনার শেষটা যেরকমই হোক, বিরাট একটা আঘাত পেতে যাচ্ছে বেচারি। শুধু যে মন ভাঙবে তাই নয়, তার কোনো আশ্রয়ও নেই।

কিন্তু আমি থাকতে মেয়েটা পানিতে পড়তে পারে না, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো রানা। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে, নেভিগেশন লাইটের আলো গায়ে মেখে রূপালি পারদের মতো হয়ে উঠেছে ফোঁটাগুলো। হুইলহাউসে ঢুকলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে নিঃশব্দে হাসলো সলোমন। মহাফুর্তিতে আছে সে।

'এই আমরা রওনা হলাম,' বলে হঠাৎ করে পাওয়ার বাড়িয়ে দিল সলোমন, জ্যান্ত ইঞ্জিন শক্তি পেয়ে গর্জে উঠলো। বড় একটা ইউ টার্ন নিয়ে হারবারের মুখের দিকে ছুটলো গোল্ডেন সান।

ঢেউ আর স্রোতের মধ্যে পড়তেই কাত হয়ে গেল মাস্তুল, জলোচ্ছ্বাস ঝাপটা মারলো জানালায়। স্টারবোর্ডের দিকে একটা স্টিমারের লাল আর সবুজ নেভিগেশন লাইট দেখা গেল। স্পীড দশ নটে নামিয়ে আনলো সলোমন, অন্ধকারের ভেতর ছুটে চললো গোল্ডেন সান।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ব্রাডি মার্ভেলাস!' সলোমনের কণ্ঠস্বর উল্লাসে অধীর। 'এরই

নাম জীবন, কি বলো ? এখন শুধু কাউন্টের সাথে দেখা হলেই পাওনাটা বুঝে নিতে পারি। তারপর আমাকে আর পায় কে !'

রাত বারোটার দিকে জনির সাথে কথা বলার জন্যে নিচে নামলো রানা। দরজা খুলে আলো জ্বাললো, ঘুরে দাঁড়াবার আগেই মাথার পিছনে কালো একজোড়া চোখের দৃষ্টি অনুভব করলো ও।

'তোমাদের জন্যে একটা সুখবর ছিলো,' রানা ঘুরতেই বললো জনি।

গুরুত্ব না দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছো ?'

'যেমন রেখেছো,' ঝাঁঝের সাথে বললো জনি। 'মাথার খুলি ভেতর দিকে ডেবে গেছে, আমার সবচেয়ে ভালো শার্টটা রক্তে ভিজে যা তা অবস্থা !'

'আর বলো না, কেঁদে ফেলবো,' দু'হাত দিয়ে ধরে জনিকে বসালো রানা। হাতের বাঁধন খুলে দিল। রোয়েনার হাত থেকে কাপটা নিয়ে বাড়িয়ে দিলো। 'এটুকু খেয়ে নাও।'

কয়েকটা চুমুক দিলো জনি। 'যাই বলো, চায়ের কোনো বিকল্প নেই। আমার ধারণা, চ্যানেল ধরে এগোচ্ছি আমরা ?'

'তোমার ধারণা নির্ভুল।'

'ক'টা বাজে ?'

'এই ধরো বারোটা—কেন ?'

হাসিটা জোরেই শুরু করলো জনি, পরমুহূর্তে ব্যথায় বিকৃত হলো চেহারা, তবু জোর করে হাসতে লাগলো। 'তারমানে

ফেরার আর কোনো পথ নেই—পয়েন্ট অভ নো রিটার্নে পৌঁছে গেছি।'

'কি বলতে চাও?'

'ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলতে পারো,' দুর্বল হাসি জনির ঠোঁটে। 'তোমরা যে আপটন মাগনা-য় আসছো, আমি জানতাম। তোমরা চলে আসার পর এড নিকলসের সাথে দেখা করি আমি।'

'এবং আপটন মাগনায় তুমি আমাদের আগে পৌঁছাও। গুডউইন আমাদের সাথে অভিনয় করছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। ঠিক দশটার পরপরই গোল্ডেন সানের খোলে আমি একটা লিমপেট মাইন আটকে দিয়েছি। চার ঘণ্টা পর ফটোর কথা। তারমানে তোমাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

'তুমি···তোমার?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার জন্যে ব্যাপারটা বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে,' জনির চেহারা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

জনির গোড়ালি থেকে কর্ড খুলে নিয়ে রানা বললো, 'ডেকে চলো। তাড়াতাড়ি।'

ওরা যেন নাগরদোলায় চড়েছে—একটা করে দশ-বারো ফিট উঁচু ঢেউ ছুটে এসে বোটকে তুলে নিচ্ছে মাথায়, পানির ঢাল বেয়ে পরমুহূর্তে নামিয়ে দিচ্ছে গভীর খাদের তলায়, তারপর আরেকটা ঢেউ ছুটে আসছে, এভাবেই চলছে সারাক্ষণ। জলোচ্ছ্বাস এখন শূন্যে ভাসমান চাদরের মতো, ডেকের গায়ে আছাড়

খেয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি হচ্ছে। জনিকে নিয়ে হুইলহাউসে ঢুকলো ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সলোমন। রানার সামনে জনিকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। 'ও এখানে কেন?'

রানার মুখে খবরটা শুনে কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো সলোমন, কিন্তু চেহারা থেকে অনিশ্চিত ভাবটা লুকাতে পারলো না। 'ওর কথা তুমি বিশ্বাস করতে বলো? শালা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকালো জনি। 'বিশ্বাস করাবার জন্যে আমি কারো পায়ে ধরে কাঁদছি না,' মিটিমিটি হাসছে সে।

মাথা নাড়লো রানা। 'কথাটা সত্যি, সলোমন।'

রানা আর জনির পিছন থেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো রোয়েনা।

'এই মাগী, চুপ কর!' খেঁকিয়ে উঠলো সলোমন। 'এমন মার মারবো···।'

কান্না থামালো রোয়েনা। ধরা গলায় বললো, 'আমি তোমার কথা ভেবে কাঁদছি, জো। তোমাকে আমি হারাতে পারবো না···।'

থ্রটল টেনে নিচু করলো সলোমন, বোটের স্পীড তিন কি চার নটে নামিয়ে আনলো। অটোমেটিক পাইলটের সুইচ অন করে পুরোপুরি ওদের দিকে ঘুরলো সে। রানার নিঃশব্দ ইঙ্গিত পেয়ে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল রোয়েনা, চোখ মুছতে মুছতে।

'বেশ, করলাম বিশ্বাস,' বললো সলোমন। 'এখন তাহলে কি করা?'

'খোলে আটকেছো, তার মানে অ্যাকুয়ালাং আর স্কিন-ডাই-

ভিং গিয়্যার ব্যবহার করেছো তুমি। কোথায় সেগুলো?'

কাঁধ ঝাঁকালো জনি। 'আমি না বললেও ওগুলো তুমি খুঁজে পাবে। সেলুনে আছে—বেঞ্চের তলায় একটা লকারে।'

'তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল, নাহিদ!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো সলোমন। 'ওটার কাছে পৌঁছুতে পারলে ডিফিউজ করা পানির মতো সহজ।'

'হতাশ করার জন্যে দুঃখিত,' বললো জনি। 'শুধু যদি ওটাকে খোল থেকে তোলা যায় তবেই ডিফিউজ করা যাবে, কিন্তু তোলার মতো ফ্যাসিলিটি বা ইকুইপমেন্ট নেই এখানে।'

'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, তাই না?' প্রশ্ন করলো রানা।

মাথা ঝাঁকালো জনি। 'ইস্পাতের খোল, কাজেই খুঁচিয়ে ওটাকে তোলা যাবে না। বেশি চেষ্টা করতে গেলে সময়ের আগেই হয়তো ফেটে যাবে।'

'কি ধরনের লিমপেট ওটা?'

'হঠাৎ আমরা টেকনিক্যাল ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছি, তাই না? কিন্তু কোনো লাভ নেই। ওহ-হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি তো আবার স্থল বাহিনীর লোক—ভাড়াটে সৈনিক ছিলে।'

চোখ পাকিয়ে জনিকে মারতে এলো সলোমন। 'প্যাচাল পাড়বি না। যা জিজ্ঞেস করছে উত্তর দে।'

সলোমনের বুকে একটা হাত ঠেকিয়ে বাধা দিলো রানা। জনিকে বললো, 'আমি শুধু সামরিক বাহিনীর লোক ছিলাম না, নৌবাহিনীর লোকও ছিলাম। পানিতেও যুদ্ধ করেছি।'

'ম্যাটিনেট মার্ক ফোর,' বললো জনি।

বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, এরকম অট্টহাসি শেষ কবে হেসেছে মনে পড়ে না রানার। পরম স্বস্তির ঢেউ উঠলো শিরায় শিরায়, বিপুল উচ্ছ্বাস দমিয়ে রাখা গেল না।

'ব্যাপারটা কি? কার হাসি কে হাসে?' থতমত খেয়ে গেছে জনি।

'বলতে পারো তোমার দুর্ভাগ্য, আরো কিছু সময় বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে,' বললো রানা। সলোমনের দিকে ফিরলো ও। 'মিনিট দশেকের জন্যে বোট থামাও, অ্যাকুয়ালাং পরে পানিতে নামবো আমি।'

'তারমানে কি মাইনটা তুমি ডিফিউজ করতে পারবে?'

'কেন পারবো না? ফিরে আসি, তখন ব্যাখ্যা করবো। তুমি শুধু বাঁদরটার দিকে লক্ষ্য রেখো।' হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল ও।

অন্ধকার পানি ভয়ানক ঠাণ্ডা, খোলের গা ঘেঁষে স্টার্নের দিকে এগোলো রানা। বিশেষ খুঁজতে হলো না, খানিক হাতড়াতেই পেয়ে গেল মাইনটা। টাইম সুইচে আঙুল রেখে কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকলো ও, তারপর সুইচের চারদিকে আঙুল বুলালো। জনি যদি চার ঘণ্টা পর বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়ে থাকে, মোট তাহলে চার পাক সুইচটা ঘুরিয়েছে সে। সর্বমোট বারো বার ঘোরানো যেতে পারে, অর্থাৎ ইচ্ছে করলে সময়টা আট ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে পারে রানা।

ধীরে ধীরে সুইচটা ঘোরাতে শুরু করলো ও। সেই সাথে গুণতে থাকলো। এক সময় আটকে গেল সুইচ, আর ঘুরবে না। খোলের গায়ে পায়ের ধাক্কা দিয়ে পিছিয়ে এলো রানা, মাথা তুললো পানির ওপর।

সলোমন আর রোয়েনা রেইলের ওপর দিয়ে উঠতে সাহায্য করলো ওকে। রোয়েনা ওর বাঁ হাত ধরেছে, হাতটায় একটু বেশি টান পড়ায় ব্যথা পেলো রানা, ঝনঝন করে উঠলো সারা শরীর।

'কি হলো, নাহিদ?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলো সলোমন।

'কিছু না,' এড়িয়ে গেল রানা। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে জনির দিকে তাকালো ও। জনির হাত দুটো সামনে, কর্ড দিয়ে বাঁধা। 'জানলে পানির মতো সোজা। মার্টিনেট অল্প মেয়াদের টাইম বোমা। শুধু নেভী নয়, আমিও ব্যবহার করে। টাইমিং ডিভাইসের দৌড় ম্যাক্সিমাম বারো ঘণ্টা। প্রায় কিছুই করতে হয়নি, আমাকে। সুইচটা ঘুরিয়ে নিউট্রাল জোনে উঠিয়ে দিয়েছি।'

'তারমানে ওটা আর ফাটবে না?'

'নিশ্চিত থাকো, বিস্ফোরণে মারা যাচ্ছি না আমরা।'

'কতো কিছুই না শেখার বাকি থাকে,' বললো জনি। 'লয পিয়েরেতে কখন আমরা পৌঁচাচ্ছি?'

'সাড়ে সাতটা—একটু আগে বা পরে,' বললো সলোমন। 'কেন?'

'স্রেফ তর সইছে না,' বললো জনি, মিটিমিটি হাসিটা আবার

ফিরে এসেছে তার ঠোঁটে। 'আমার ধারণা সবার জন্যেই ওখানে মস্ত একটা হাসির অ্যাটম বোম অপেক্ষা করছে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচে নেমে গেল সে, নিচ থেকেও তার শিসের শব্দ শুনতে পেলো ওরা।

নয়

কাঁধে ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ মেলে দেখলো, ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে রোয়েনা। সেলুনের একটা লম্বা বেঞ্চে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। মেঝেতে পা নামিয়ে উঠে বসলো, রোয়েনার হাত থেকে ধূমায়িত কাপটা নিয়ে চুমুক দিলো কফিতে। 'ধন্যবাদ, রোয়েনা। ক'টা বাজে বলো তো?'

'ছ'টা।'

'গড, এতোক্ষণ ঘুমিয়েছি!'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এলো রানা, এক হাতে কফির কাপ। স্টারবোর্ডের দিকে, রেইলের বাইরে নাচানাচি করছে সাগর, মাঝে মধ্যে লাফ দিয়ে ডেকে আছড়ে পড়ছে ফেনাসহ। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সেই সাথে ঝাপটা দিচ্ছে বাতাস। বার বার স্টারবোর্ডের দিকে উঁচু হয়ে উঠছে ডেক, রেইল ধরে তাল রাখতে রাখতে হুইলহাউসে ঢুকলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে একবার দেখলো সলোম।।

'কেমন ঘুমালে?' ক্ষীণ অভিযোগের সুরে জানতে চাইলো সে।

'হাতের ব্যথাটা বেড়েছে,' বললো রানা। 'তবে ব্যবহার করতে পারবো। এবার তুমি খানিক বিশ্রাম নিতে পারো।'

'আমি আসলে সময়টা দারুণ উপভোগ করছি। ঘণ্টাখানেক হলো ফুলে-ফেঁপে উঠেছে সাগর। শান্ত হবার আগে আরো খানিক অশান্ত হবে বলে মনে হয়।'

'তাতে আমাদের পৌঁছুতে কতটা দেরি হবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'তুমি একটু হুইলটা ধরো, চার্ট দেখে বলছি।'

পাইলটের সিটে বসলো রানা, সলোমন চার্ট-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দু'একটা হিশেব কষে পেন্সিলটা রেখে দিলো সে, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলো। 'আরো বেশি-হয় আগে পৌঁছুবো আমরা। অবশ্য নির্ভর করছে আবহাওয়া বদলায় কিনা তার ওপর। কিছুক্ষণ সামলাতে পারবে তো?'

'না পারার কি আছে।'

'আসছি, দেখি রোয়েনা আমাকে কিছু খেতে দিতে পারে কিনা। পরে আমরা আলাপ করবো, কেমন?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো রানা।

'কিসের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি এখনো আমরা জানি না, নাহিদ,' বললো সলোমন। 'আমার মনে হয় জনির পেটে পা দিলে কিছু বেরুবে।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'দেখা যাক।'

পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, সিটে হেলান দিলো রানা।

হুইলে একটা হাত রেখে সিগারেট ধরালো ও। এরইমধ্যে অন্ধকার কেটে যেতে শুরু করেছে। পানির শেষ প্রান্তে আলোর ক্ষীণ একটু আভা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো রানা, যেন এরপর কি ঘটবে দেখার চেষ্টা করছে।

একটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য যতো বিপদই আসুক, সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে জো সলোমন। লোকটাকে দেখার আগে থেকেই পছন্দ হয়নি রানার। ডোশিয়ে পড়েই লোকটা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মায় মনে। দেখার পর সে ধারণা বদলায়নি, বরং আরো দৃঢ় হয়েছে। ফ্রাইডেথর্প জেলখানার কথা মনে পড়লো। একই সেলে ছিলো ওরা, ধীরে ধীরে কৌশলে সলোমনের বিশ্বাস অর্জন করেছে ও। খবরের কাগজ আর বিনোদন পত্রিকাগুলোয় তার সম্পর্কে যাই বলা হোক, আসলে সলোমন রবিন হুড নয়। নিজের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে বন্ধুত্ব, চক্ষুলজ্জা, ভালোবাসা, একসাথে সব বিসর্জন দিতে পারে সে।

মেয়েটিকে নিয়েই ভয় রানার। সলোমন যে কতোটুকু নিষ্ঠুর হতে পারে রোয়েনার সে ধারণা নেই।

পাঁচ বছর বন্দী জীবন কাটিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে সলোমন, আবার তাকে বন্দী করার চেষ্টা হলে সামনে যাকে পাবে তাকেই কচুকাটা করবে সে।

হাসপাতালের ঘটনাটা মনে পড়লো রানার। জনির পিস্তলটা ওর হাতে পড়েছিল বলে, তা না হলে সলোমন ওকে অবশ্যই

সাথে নিতে রাজি হতো না। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, নাহিদকে সাথে না নিলে তারও পালানো হবে না। অথচ মেশিনশপে দু'বার মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে রানা—অন্তত গুরুতর আহত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে।

রোয়েনার কথা আবার ফিরে এলো মনে। সরল মেয়েটা যদি ওর প্রশ্নের উত্তর না দিতো বা অন্যভাবে দিতো, তাহলে হয়তো ওদের দু'জনকেই টুইডের কুয়ায় পড়ে মরতে হতো। অথচ রোয়েনাকে সলোমন রাস্তায় ফেলে আসতে চেয়েছিল। মেয়েটা কাজে আসবে, রানা এই যুক্তি না দিলে অনেক আগেই তাকে ভাগিয়ে দিতো সলোমন।

ক্লেম্যাটরিয়ামে আরেকবার সলোমনকে বাঁচিয়েছে রানা। অথচ ওকে বাদ দিয়েই বোট নিয়ে রওনা হয়ে যাচ্ছিলো সে। এমন একটা লোক, নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বিবেচনার মধ্যে রাখে না। এ-ধরনের একটা লোক যদি টের পায়, রানা তাকে আবার জেলখানায় ফেরত পাঠাতে চাইছে, কী মূর্তি ধারণ করবে কল্পনা করতেও ভয় লাগে।

দ্বীপের কথা ভাবলো রানা। কি আছে ওখানে কে জানে। তেমন কোনো অস্ত্র নেই ওদের হাতে, কাউন্টের সাথে কি দিয়ে লড়বে ওরা? লড়াই যে একটা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ওদের একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে বুদ্ধি—উপস্থিত বুদ্ধি।

তবে সলোমনের ওপর ভরসা করা উচিত হবে না। ওর ভোঁতা কুবুদ্ধি কোনো কাজে আসবে না।

হাসান কোথায় আছে, বেঁচে আছে কিনা, কিছুই জানা নেই।

হাসান হয়তো জিম্মি হয়ে আছে কাউন্টের হাতে। তা যদি থাকে, রানার প্রথম কাজ হবে তাকে উদ্ধার করা। আর সব তুচ্ছ। হাসানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট। তারপর কাউন্টকে বন্দী করতে পারলে সেটা হবে উপরিপাওনা।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা, চেহারায় বাঁধন ছেঁড়া হাসি আর বৃষ্টির পানি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো সলোমন। 'এতো আনন্দ বোধহয় জীবনে কখনো পাইনি, নাহিদ। বুঝতে পারিনি পাঁচ বছর ধরে কি হারাচ্ছিলাম! সরো, সরো, আমাকে হুইল ধরতে দাও!'

সিট থেকে উঠে এসে দরজার গায়ে হেলান দিলো রানা। পুব দিকে ঘন কালো মেঘ জমেছে, আরো খারাপ হবে আবহাওয়া। বোটের স্পীড বাড়িয়ে দিলো সলোমন। আপনমনে হাসতে লাগলো সে।

তার আনন্দে সাড়া না দিয়ে পারলো না রানা। 'একটা কথা ঠিকই বলেছো। ফ্রাইডেথর্পে কুকুরের মতো বেঁচে ছিলাম আমরা।'

'ফ্রাইডেথর্প?' মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সলোমন, যেন জায়গাটা কোথায় স্মরণ করার চেষ্টা করলো। 'তাহলে শুনে রাখো, নাহিদ। দুনিয়ার কেউ আমাকে সেখানে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। দরকার হলে আত্মহত্যা করবো আমি, এই বোট ডুবিয়ে দিয়ে হাঙরের খোরাক হবো, কিন্তু ফিরে আর যাচ্ছি না।'

নিজের অজ্ঞাতেই ভয়ংকর একটা ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে

বসেছে সলোমন।

বিষণ্ণ বোধ করলো রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল ও।

রোয়েনার সাথে বসে একটা স্যাণ্ডউইচ আর এক কাপ কফি খেলো রানা। তারপর দেখতে এলো জনিকে। দেয়ালের দিকে মুখ করে বাঙ্কে শুয়ে আছে সে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরলো। আগের চেয়ে অনেক ম্লান দেখালো তাকে। মিটিমিটি হাসিটাও অদৃশ্য হয়েছে।

'কি হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করলো রানা, ধরে বসালো।

'সাগর আমার জন্মশত্রু,' ঢোক গিলে বমি বমি ভাবটা দূর করলো জনি। 'সী-সিকনেস।'

কেবিন থেকে তাকে বের করে আনলো রানা। প্যাসেজ হয়ে সেলুন ঢুকলো ওরা। মৃদু ধাক্কা দিয়ে জনিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো রানা। 'কফি চলবে?'

'আমরা বন্ধু হতে পারলে মন্দ হতো না,' ক্ষীণ একটু হাসলো জনি। 'কিন্তু তা নই।'

নিঃশব্দে ইঙ্গিত করলো রানা, এনামেলের মগে কফি ঢেলে বাড়িয়ে দিলো রোয়েনা। কর্ড বাঁধা দুই হাত দিয়ে মগটা ধরে মুখের সামনে তুললো জনি। 'কতোক্ষণ পেটে থাকবে জানি না —দেখা যাক।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে জনির ঠোঁটে গুঁজে দিলো রানা। 'এবার আমরা কথা বলবো।'

'তাই ? কি কথা শুনতে চাও, বুড়ো খোকা ?'

'লঘ পিয়েরে-তে কি দেখবো আমরা ? কাউন্টকে পাবো ওখানে ?'

'পেলে বলবো তোমাদের কপাল মন্দ।'

'রিপ হটনকে ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে, তাই না ?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালো জনি। 'এর আগেও তুমি তার কথা জানতে চেয়েছো।'

'কারণটাও পরিষ্কার,' বললো রানা। 'জন হেরিক আর রিড কোয়েনকে এতো দূর আসতে দেয়া হয়নি, মেরে কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়েছে। পথে যার সাথেই কথা হয়েছে, রিপ হটনকে খুন করার কথা স্বীকার করেনি কেউ। জানতে ইচ্ছে করে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হলো কেন!'

'আমি জানি না।'

'কোথায় আছে তাও জানো না ?'

'কিছুই জানি না,' জনির চেহারায় জেদের একটা ভাব লক্ষ্য করলো রানা।

'তারমানে বলবে না।'

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকালো জনি।

'দ্বীপে কাউন্টের সেট-আপটা কি রকম ?'

আবার একটু হাসলো জনি। 'এ-সব প্রশ্নের উত্তর তুমি আশা করতে পারো না, বুড়ো খোকা। যাই ঘটুক, আমি মহামান্য কাউন্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো।'

'মহামান্য ?'

'আমরা যারা তার কাজ করি, তাদের কাছে।'

রানা গম্ভীর হলো। 'তুমি আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছো। চাই না, কিন্তু উপায় নেই। যাই, সলোমনকে পাঠিয়ে দিই।'

মিটিমিটি হাসলো জনি। 'তাকে আমি একবিন্দু ভয় করি না, বুড়ো খোকা।'

'করা উচিত। কারণটা বলি। সলোমনের তুলনায় আমি স্রেফ অ্যামেচার। সলোমন জানে, পুলিশ একবার ধরতে পারলে আবার অন্তত পনেরো বছরের জন্যে বন্দী থাকতে হবে তাকে। দ্বিতীয়বার আর পালানো সম্ভব হবে না, প্রতিটি সেকেণ্ড ওর ওপর সতর্ক নজর রাখা হবে।'

'তাতে কি?'

'সেটা ঠেকাবার জন্যে দরকার হলে সলোমন তোমাকে জবাই করবে।'

জনির চেহারায় ভয়ের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, তবে হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ঠোঁট থেকে, সামান্য একটু কুঁচকে উঠলো দুই ভুরুর মাঝখানটা। সলোমনের কথা নয়, রুথ ব্র্যানশির কথা ভাবছে সে। বুড়ির ভবিষ্যদ্বাণীটা মনে পড়ে গেছে। আপনমনে মাথা ঝাঁকালো। না, এতো সহজে বুড়ির কথা ফলতে দেবে না সে। মৃত্যু যদি আসেই, খুঁজে বের করে নিক ওকে— স্বেচ্ছায় সে ধরা দিতে যাবে না। 'ঠিক আছে,' শান্ত সুরে বললো সে। 'কাউন্ট দ্বীপে থাকতে পারেন, নাও পারেন। সত্যি আমি জানি না। সাধারণত বোটে করে আসেন না তিনি।

প্রাইভেট হেলিকপ্টার আছে।'

'লণ্ডনের ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট? ওটা তো কাউন্ট মাভো বুয়ার্দের একটা প্রতিষ্ঠান, তাই না?'

চোখ জোড়া বড় করলো জনি, তারপর কুঁচকে সরু করলো। 'মাই গড। বুড়ো খোকা, এটা তুমি জানলে কিভাবে? তার মানে আরো অনেক কিছু জানো!' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো সে। 'শুরু থেকেই তোমাকে আমার ভালো লাগেনি—নিজেও বোধহয় জানো না, তোমাকে ঘিরে অদৃশ্য একটা আলো আছে—অশুভ একটা রশ্মি।'

'বাড়িতে ক'জন লোক আছে কাউন্টের?'

'সব সময় সবাই থাকে না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো জনি। 'বেশিরভাগ সময় শুধু একজন কেয়ারটেকার থাকে—এক এক সময় এক একজন। এখন সম্ভবত হরি নামে বিশ্বস্ত এক লোক আছে। মহামান্যের বডিগার্ড হিসেবেও কাজ করে সে।'

'হরি? পুরো নাম কি? লোকটা ভারতীয়?'

'ভারতীয় কিনা জানি না, পুরো নামটাও কোনোদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে জানি মহামান্য কাউন্টের সাংঘাতিক ভক্ত সে। কাউন্টও তার প্রশংসায় পঞ্চ মুখ। প্রায়ই বলেন, হরি আমার খুব প্রিয় ছাত্র।'

'ছাত্র?'

'মনে হচ্ছে অবাক হলে?' মিটিমিটি হাসছে জনি।

'তারমানে কি তোমার কাউন্ট···।'

'হ্যাঁ, তিনি একজন শিক্ষকও বটেন। দুঃখিত, এ-ব্যাপারে

আর কিছু জিজ্ঞেস করো না আমাকে।'

প্রফেসর? প্রফেসর কবীর চৌধুরী? কিন্তু তা কি করে হয়! রানা নিজ চোখে দেখেছে, টেনে পানির তলায় নিয়ে গেল তাকে হাঙরগুলো।

কিন্তু সত্যিই কি দেখেছে? হাঙরগুলো তার চারপাশে লাফালাফি করেছিল। একটা হাঙর বারবার ঝাবলা দিয়ে কবীর চৌধুরীর গা থেকে মাংস তুলে নিয়ে যাচ্ছিলো। একটা চোখ খোয়া গেল, তাও দেখেছে রানা। সবশেষে একটা হাত ছিঁড়ে নিয়ে গেল! তারপরও ব্যারিয়ারের দিকে এগিয়ে আসছিল কবীর চৌধুরী, একটা চোখ দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো রানার দিকে। তারপর···তারপর?

তারপর রানা কিছুই দেখেনি। পানির তলায় ডুবে গেল কবীর চৌধুরী, মনে হলো হাঙরই বুঝি তাকে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু আর দেখার ছিলোই বা কি? হাঙর ছাড়া আর কি-ই বা তাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে আসবে ওখানে?

জনিকে কেবিনে রেখে দরজায় তালা দিলো রানা, রোয়েনাকে নিয়ে প্যাসেজ ধরে রওনা হলো হুইলহাউসের দিকে। পথে রোয়েনা বললো, 'লোকটাকে আমার ভয় করে, মিঃ নাহিদ।'

'ভয় কিসের—আমি আছি না?' হঠাৎ থেমে রোয়েনার কাঁধে একটা হাত রাখলো রানা। 'এই, তোমার চোখ দুটো টকটকে লাল কেন? কেঁদেছো, নাকি ঘুমাওনি?'

মাথা নিচু করলো রোয়েনা, কথা বললো না।

'কাঁদলেও তোমার মনের আশা পূরণ হবার নয়,' একটু কঠিন

সুরেই বললো রানা। 'তারচেয়ে ওর কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করো। আরেকটা কথা। কোথায় যাবে, কি করবে, এ-সব কথা না ভাবলেও পারো। আশ্রয়ের দরকার হলে কোনো চিন্তা নেই। তোমাকে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।'

কথাগুলো বলেই রানা বুঝলো, ভুল হয়ে গেল। চেহারায় গোঁয়ার্তুমির ভাব নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রোয়েনা। রানার একটা কথাও তার পছন্দ হয়নি।

'আমাদের সাথে থাকতে হবে না, যাও তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও,' বলে একাই ডেকে উঠে এলো রানা। এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, তবে সাগর আগের চেয়ে অনেক শান্ত হয়ে গেছে। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লো ও, কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করে আবার নেমে এলো নিচে। সারির প্রথম কেবিনে জনি রয়েছে, তৃতীয়টায় পাওয়া গেল রোয়েনাকে। দেয়ালের দিকে মুখ করে বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে সে। ফুলে ফুলে উঠছে তার পিঠ। কেবিনে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা, তারপর একটা চাদরের ভাঁজ খুলে রোয়েনার পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিলো। যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থাকলো মেয়েটা, পাশ ফিরে তাকালো না। তার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

হুইলহাউসে ফিরে এলো রানা। সকালের আবছা আলোয় সলোমনের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, যদিও তার আনন্দ উল্লাসে এতোটুকু ভাটা পড়েনি। রানাকে দেখেই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে একগাল হাসলো সে। 'এইমাত্র আলডারনে-র সাথে যোগাযোগ করেছিলাম।'

'আর কতোক্ষণ?'

'আধ ঘণ্টা। সাগর শান্ত হয়ে গেছে কাজেই ফুল পাওয়ারে ছুটছি আমরা। একটাই উদ্বেগের বিষয়—কুয়াশা।'

'তোমার ধারণা সিরিয়াস হয়ে উঠবে?'

'বলা কঠিন, তবে আসছে খুব জোরেশোরে। ভালো দিকও একটা আছে। দ্বীপ থেকে ওরা কেউ দেখতে পাবে না যে আমরা আসছি।'

'জনির সাথে এইমাত্র কথা বলে এলাম।'

'কিছু বের করতে পারলে?'

'কাউন্ট হেলিকপ্টারে আসা-যাওয়া করে।'

'দ্বীপে এখন আছে?'

'ও নাকি জানে না।'

মাথা নাড়লো সলোমন। 'বিশ্বাস করি না। আমি যাই পেটে পা দিই গিয়ে।'

'দরকার নেই। আমার ধারণা সত্যি কথাই বলছে। তাছাড়া, ভয়-ডর নেই, কথা আদায় করা কঠিন। বাড়িটায় প্রায় সময় শুধু একজন কেয়ারটেকার থাকে।'

'তাহলে কি করা হবে ভাবো,' বললো সলোমন। 'চার্টটা ভালো করে দেখেছি আমি, গুডউইন ঠিকই বলেছিল। জেটি-ই একমাত্র সম্ভাব্য অ্যাংকারেজ। কিন্তু ওখানে ভিড়লে বিপদে পড়তে পারি।'

'ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। একটা আইডিয়া আছে মাথায়। এসো, চার্টটা আরেকবার দেখি।'

অটোমেটিক পাইলট অন করে রানার পাশে চলে এলো সলোমন। 'যদি ভেবে থাকো অন্য কোথাও ভিড়তে পারবে, ভুল করবে। চার্টটা আমি বারো বার পরীক্ষা করেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'আগে শোনোই তো। পশ্চিম ঢালে একটা গর্তের ভেতর বাড়িটা। আমরা যদি পুব দিকে যাই, উঁচু পাঁচিলগুলো ওদিকেই, তাহলে কেউ দেখতে পাবে না, বিশেষ করে কুয়াশার মধ্যে।'

দ্রুত মাথা নাড়লো সলোমন। 'পুব দিকে কোথাও অ্যাংকারেজ নেই।'

'হয়তো তাই,' বললো রানা, 'কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে ছোটোখাটো প্রচুর জায়গা আছে, ক্যাপ্টেন সাহস করলে সেখানে ছোটো একটা ডিঙ্গি ভিড়াতে পারবে।'

দ্বিধায় পড়ে দুলতে লাগলো সলোমন। 'শুনে মনে হয় যুক্তি আছে, কিন্তু এদিকের পানি আমি খুব ভালো করে চিনি, নাহিদ। পাহাড়-পাঁচিলগুলোর নিচে অসম্ভব ফেনা থাকবে, তলায় লুকিয়ে আছে ডুবো-পাথর, কাছাকাছি যাবার আগেই উল্টে যাবে বোট।'

'তবু হয়তো ওদিকে না গিয়ে আর কোনো উপায় থাকবে না,' কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'সময় হলে বোঝা যাবে।

দশ

ধোঁয়াটে, কালচে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে বোট, যেন অনন্তকাল ধরে। ঘন ঘন বিস্ফোরণের আওয়াজে কান পাতা দায় হয়ে উঠলো, দূরে কোথাও যেন বিরতিহীন বজ্রপাত ঘটছে—আসলে তা নয়, ফেনিল সাগর-তরঙ্গ প্রচণ্ড আক্রোশে বিস্ফোরিত হচ্ছে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে।

গোল্ডেন সান দুই কি তিন নট গতিতে এগোচ্ছে, নিস্তেজ হয়ে আছে এঞ্জিন। হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সলোমন, ব্যগ্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে, বিপরীত মুখী স্রোতধারা অনুভব করে বুঝতে পারছে, পাহাড় আর বোটের মাঝখানে দূরত্ব খুব বেশি নয়।

বোটের নাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। আচমকা সামনে একটা হাত লম্বা করে দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো ও। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাসের শক্তিশালী ঝাপটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল

ঘন কুয়াশার খানিকটা পর্দা, ঠিক সামনেই উন্মোচিত হলো শ্বাস-রুদ্ধকর দৃশ্যটা—কালো চকচকে পাহাড়-পাঁচিল।

সম্ভবত দুশো গজ দূরে ওগুলো, মাথার দিক ধোঁয়াটে কুয়াশায় সম্পূর্ণ ঢাকা, হাজার হাজার পাথুরে খোপ আর কার্ণিশে গিজগিজ করছে সামুদ্রিক পাখি। পাঁচিলগুলোর গোড়ায় প্রকৃতি ফুঁসছে, এবড়োখেবড়ো পাথরের গায়ে জ্যান্ত সাগর যেন ব্যাকুল ব্যগ্রতায় আত্মাহুতি দিয়ে চলেছে অবিরাম।

পিছু হটে হুইলহাউসে ঢুকলো রানা। 'কি মনে করো তুমি?'

মাথা নাড়লো সলোমন। 'মোটেও ভালো মনে হচ্ছে না।'

তবু সাহস করে বোট নিয়ে এগোলো সলোমন। পাঁচিলের গোড়া যখন পঞ্চাশ গজ দূরে, মনে হলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে গোল্ডেন সান। তীব্রগতি ঢেউগুলো সামনে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে দিক বদলালো সে। গোড়ালির ওপর ঘুরে গিয়ে হাত লম্বা করলো রানা, পাথরের মাঝখানে ঘোড়ার পায়ের নাল আকৃতির একটা জায়গা দেখালো সলোমনকে, সেটার পিছনে নুড়ি ছড়ানো সরু একটা জায়গা। 'ওটা দেখে কি মনে হয়?'

আবার মাথা নাড়লো সলোমন। 'এখনো সেই একই কথা বলি আমি, ওই ফেনার মধ্যে পাঁচ মিনিটও টিকবে না ডিঙ্গি।'

'কিন্তু আমি যদি অ্যাকুয়ালাং পরে থাকি?'

ঝট্ করে ঘুরলো সলোমন। 'একটা নতুন কথা বললে বটে। তবে, ফিফটি ফিফটি চান্স—হাতটার কথা ভুলছি না।'

হেসে উঠলো রানা। 'বুঝলাম, তুমি যেতে পারছো না, আমিই

নির্বাচিত হয়েছি।'

নিচে নেমে এসে সেলুনের লকার থেকে স্কিন-ডাইভিং ইকুইপমেন্ট বের করলো রানা। অনেকগুলো বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে ও, তার মধ্যে একটা অবশ্যই ঠাণ্ডা। ব্যস্ত হাতে প্যান্ট-শার্টের ওপর কালো রাবারের ডাইভিং স্যুট পরে নিলো, পকেটে রইলো এড নিকলসের পিস্তল, চেইন টেনে বন্ধ করলো পকেটের মুখ, অ্যাকুয়ালাং হাতে বেরিয়ে এলো ডেকে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দ্রুত হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এলো সলোমন। 'যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি করবে। কিছু টের পাবার আগেই স্রোতের ধাক্কায় পাথরে আছাড় খেতে পারে বোট।'

'ঘণ্টাখানেক সময় দিয়ো আমাকে,' বললো রানা। ডেভিডস থেকে ডিঙ্গিটা নামালো ওরা। 'তারপর ফিরে এসে আমাকে দেখে যেয়ো। যদি নুড়ির ওপর দেখো, বুঝে নেবে আমি চাইছি জেটিতে গিয়ে নোঙর ফেলো তুমি। আর যদি ফেনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখো···,' কাঁধ ঝাঁকালো রানা,···'বুঝতে হবে প্ল্যানটা মাঠে মারা গেছে। তোমার ঘড়িটা বরং আমাকে দাও।'

ঘড়ি খুলে রানার হাতে দিলো সলোমন। 'তখন তুমি কি করবে?'

'চেষ্টা করে দেখবো সাঁতরে বোটে ওঠা যায় কিনা।'

কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো সলোমন। 'চেষ্টাটা দেখার মতো হবে। মা-বাপের দোয়ায় আমাকে যেতে হচ্ছে না! এসো, ডিঙ্গি নামাই।'

ফাইবার গ্লাসের তৈরি ডিঙ্গিটা খুবই হালকা। পানিতে সেটা

নামাবার পর লাইন ধরে থাকলো সলোমন, ব্যস্ত হাতে অ্যাকু-য়ালাঙের স্ট্র্যাপ লাগালো রানা। মুখের ওপর ভাইজর নামালো, এয়ার ফ্লো অ্যাডজাস্ট করলো, তারপর নেমে পড়লো ডিঙ্গিতে। রেইলের ওপর ঝুঁকে হাত নাড়লো সলোমন, ঢিল পড়লো লাইনে। হাত বাড়িয়ে বৈঠা ধরতে যাবে রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ডিঙ্গিটাকে বোটের পাশ থেকে ছিনিয়ে নিলো একটা ঢেউ।

আধ ঘণ্টা ধরেই বাতাসের গতিবেগ বাড়তে শুরু করেছে। উঁচু ঢেউগুলোর মাথায় সাদা ফেনা। তৃতীয় বারের চেষ্টায় বৈঠার নাগাল পেলো রানা।

খক খক আওয়াজের সাথে জ্যান্ত হয়ে উঠলো এঞ্জিন, গোল্ডেন সান নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকালো রানা। জলোচ্ছ্বাসের পর্দা ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে আছে পাহাড়-প্রাচীর, কর্কশ পাথুরে গোড়ায় টগবগ করে ফুটছে রাশি রাশি ফেনা। ডিঙ্গির খোল থেকে কাঁপা একটা আওয়াজ পেলো রানা, বার কয়েক পাক খেলো সেটা। বিপদটা টের পেতে খুব বেশি সময় লাগলো না। ডুবো-পাথরের ক্ষুরের মতো ধারালো ডগায় ঘষা খেয়েছে ডিঙ্গির খোল, প্রায় দু'ফাঁক হয়ে গেছে ফাইবার গ্লাস।

তবু প্রাণপণ চেষ্টা করলো সে ডিঙ্গিটাকে ভাসিয়ে রাখতে। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। চিরে যাওয়া খোল থেকে হু হু করে পানি উঠছে, তবে ডিঙ্গিটা একদিকে কাত করে রাখলে পানি কম ওঠে। এদিকে রানা শুধু ডান হাতটা পুরোপুরি ব্যবহার করতে

পারছে। আরেকটা বিপদ এসে সম্পূর্ণ অসহায় করে দিয়ে গেল ওকে। তীব্র স্রোতের টানে হাত থেকে খসে গেল বৈঠা। ডিঙ্গির কিনারা আঁকড়ে ধরে পাটাতনের ওপর পড়ে থাকলো রানা। নিজেকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

পাঁচিলগুলো এখন খুব কাছে চলে এসেছে। বিশাল আকারের কার্ণিশের ওপর বিকট শব্দে আছাড় খাচ্ছে সাগর, সাদাটে নোংরা ফেনায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পাঁচিলের গোড়া অনেক উঁচু পর্যন্ত। দোতালা সমান একটা ঢেউ সেদিকেই ঠেলে নিয়ে চললো ডিঙ্গিটাকে।

কখন যে পানিতে পড়লো রানা বলতে পারবে না। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পানির তলায় ডুবে থাকলো ও। মাথা তোলার পর দেখার সুযোগ হলো প্রথম সারি পাথরের ওপর আছাড় খাচ্ছে ডিঙ্গিটা। আরেকটা ঢেউ এসে অনেক ওপরে, শূন্যে তুলে নিলো ওটাকে। রিফ-এর গায়ে আরো দু'বার আছাড় খেলো প্রাণপ্রিয় বাহন, তারপর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পাথরগুলোর ডান দিকে প্রায় সমতল খানিকটা পানি দেখলো রানা। পিছনে আরো একটা ঢেউ মাথাচাড়া দিচ্ছে দেখে সেদিকে ডাইভ দিয়ে পানির তলা দিয়ে দ্রুত সাঁতার কাটতে শুরু করলো ও। রাবারের লম্বা পা ছুঁড়ে প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়িয়ে চললো।

চারদিকে বিপুল আলোড়ন। ফুটন্ত ফেনা, ছুটন্ত বুদবুদ, ধেয়ে আসা বালির পাহাড়, ঝমঝম কাঁকর বৃষ্টি, ইত্যাদির মাঝখানে পড়ে গেছে রানা। তারপর, যেন একটা দানবের হাত ওকে ধরে

ওপর দিকে তুলতে শুরু করলো।

সমতল পানির ওপর মাথা তুললো রানা। ওর দু'পাশে কালো পাথরের চকচকে গা। পরমুহূর্তে রানা দেখলো, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ও, ওর নিচে আড়মোড়া ভাঙছে সচল বালি আর জ্যান্ত নুড়ি পাথর।

দানবের একটা হাত আবার সাগরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো ওকে। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোলো রানা। পানির সবুজ পর্দায় আবার একবার চাপা পড়লো ও, ডুবে গেল শরীর-টা। পানি সরে যেতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, হোঁচট খেতে খেতে এগোলো সামনের দিকে। এক মুহূর্ত পর পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় সরু সৈকতে পৌঁছুলো ও।

পাহাড়-প্রাচীর থেকে চারশো গজ দূরে সরে এলো গোল্ডেন সান। তিন নট স্পীডে আরো দূরে সরে আসছে, অটোমেটিক পাইলট অন করে ডেকে এসে দাঁড়ালো সলোমন, চোখে বায়নোকিউলার তুলে রানার দিকে তাকালো।

ক্ষুদে, সরু সৈকতে কালো একটা মূর্তি, মাথার ওপর হাত তুলে একবার মাত্র নাড়লো। পরমুহূর্তে ধোঁয়াটে কুয়াশার গাঢ় পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেল রানা।

চোখ থেকে বায়নোকিউলার নামিয়ে বিড়বিড় করে উঠলো সলোমন, 'মরুকগে!' কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে এগোলো সে, নিচে নেমে এসে রোয়েনাকে খুঁজলো। কেবিনে নেই দেখে প্যাসেজে বেরিয়ে এসে ডাকলো সে, গ্যালি থেকে জবাব দিলো

রোয়েনা। আরো কফি বানাচ্ছে মেয়েটা।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় ঘুমাচ্ছো,' রোয়েনার চওড়া নিতম্বের দিকে চোখ রেখে বললো সলোমন।

মাথা নাড়লো রোয়েনা। 'ঘুম আসেনি—মাথায় অসহ্য ব্যথা।'

হাত দুটো নিয়ে কি করবে ঠিক করতে না পেরে দুই তালু এক করে ঘষতে শুরু করলো সলোমন। গায়ের কোট খুলে ফেলেছে রোয়েনা, ছোটো গাউন আর আঁটসাঁট ব্লাউজ পরে আছে। 'ডিঙ্গি নিয়ে সৈকতে নেমেছে নাহিদ, বোট ভেড়ানো যায় কিনা দেখে সিগনাল দেবে। ঘন্টাখানেক অপেক্ষা না করে উপায় নেই।' কাছে চলে এলো সে।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো রোয়েনা। তার কাঁধে একটা হাত পড়লো।

'না,' বিড়বিড় করে বললো সে।

'কেন,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসলো সলোমন, 'বলছিলে না মাথা ধরেছে? এরচেয়ে ভালো দাওয়াই আর আছে?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো রোয়েনা। 'ছাড়ো।'

রোয়েনার মসৃণ গলায় হাত দিলো সলোমন। হাতটা চেপে ধরতে গেল রোয়েনা, কিন্তু তার আগেই সলোমন সেটা তার কাপড়ের ভেতর গলিয়ে দিলো।

'মাগো!' যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো রোয়েনা। সলোমনের গা ঘেঁষে এলো সে, আবার যাতে ব্যথা পেতে না হয়। 'তুমি এমন নিষ্ঠুর কেন, জো? আমার বুঝি লাগে না?'

'এই লাগাই অনেকে পছন্দ করে, তুমি করো না?' খিকখিক করে হাসলো সলোমন। রোয়েনার শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হাত।

চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকলো রোয়েনা, বন্ধ পাতার কোণে চিকচিক করছে পানি, মাঝে মধ্যে টলছে সে। এভাবে কিছুক্ষণ সহ্য করার পর মৃদু কণ্ঠে বললো সে, 'হয়েছে?'

'শেষ না শুরু?' রোয়েনাকে ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো সলোমন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সরে যাবে রোয়েনা, তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টানলো সে। কোলের ওপর পড়লো রোয়েনা।

'হ্যাঁ, শুরু হয়েছে,' বলে কাঁপা হাতে রোয়েনার জামা খুলতে শুরু করলো সলোমন।

'জো,' আবেদনের সুরে বললো রোয়েনা, 'এখন না। মাথায় এতো ব্যথা, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবো। প্লিজ, এখন না।'

'এ-সব কাজে বাধা পেলে মাথায় খুন চেপে যায় আমার,' বলে কনুই দিয়ে রোয়েনার পাঁজরে গুঁতো মারলো সলোমন। ঁক করে একটা আওয়াজ বেরুলো রোয়েনার গলা থেকে।

'ডার্লিং, ওহ্ ডার্লিং!' আনন্দে আর উল্লাসে চোখ ছোটো ছোটো হয়ে এলো সলোমনের। 'কেউ বলবে না কাপড়ের তলায় তুমি কুৎসিত।'

পাঁজর আর মাথার ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলো রোয়েনা। হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে। 'জো, এরপর কি হবে বলো তো?'

'এরপর কি হবে মানে ?' হাসতে হাসতে রোয়েনাকে কাছে টানলো সলোমন। 'এরপর এই হবে !'

'ঠাট্টা নয়, জো,' কাপড় খুলতে সলোমনকে সাহায্য করলো রোয়েনা। 'আমি জানতে চাইছি, এরপর কোথায় যাবো আমরা ? ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলে তোমার দরকার নিরাপদ একটা ঠিকানা, আর আমার দরকার তোমার বুকে একটু আশ্রয়।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল সলোমনের ব্যস্ত হাত। 'যখন-কার কথা তখন ভাবা যাবে,' বললো সে।

কিন্তু রোয়েনা নাছোড়বান্দা। 'প্ল্যানটা করে রাখতে দোষ কি, বলো ? একটা কথা মনে রেখো, কোনো মেয়ে তোমাকে যদি সুখী করতে পারে তো সে আমি। জানি, দেখতে ভালো নই, কিন্তু আমি তোমার এমন সেবা করবো··· ।'

'ডার্লিং, আমাকে বেঈমান ভেবো না,' রোয়েনার দৃষ্টির আড়ালে চোখ মটকালো সলোমন। 'অসহায় নারীকে আমি বঞ্চিত করতে পারি না। এই মুহূর্তেও কি তার প্রমাণ পাচ্ছো না ?' নিজের পাশে রোয়েনাকে জোর করে শোয়ালো সে।

শেষ কেবিনটার দেয়ালে কে যেন ঘুসি মারছে। তারপরই জনির চিৎকার শোনা গেল, 'এই যে, বুড়ো খোকা, এদিকে আসার একটু সময় হবে নাকি ? আমার কাছে একটা খবর আছে, আবার তোমার স্ট্রোক হবার জন্যে যথেষ্ট।'

'কি বলে বানচোতটা ?'

সলোমন কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে আবার চিৎকার করলো জনি, 'নিজের ভালো চাও তো তাড়াতাড়ি শুনে যাও

হে।'

রোয়েনাকে ছেড়ে উঠে পড়লো সলোমন। উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এরপর আর পড়ে থেকে কোনো লাভও হতো না। রোয়েনা কাপড়গুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। তালা খুললো শেষ কেবিনটার। 'শালার দেখছি একেবারেই সময়জ্ঞান নেই। কি বলতে চাস?'

'নাহিদ কোথায়?'

'তীরে গেছে।'

'উদ্যোগী লোক, সন্দেহ নেই। তা না হলে কাউন্টের পরিচয় জানতে পারে!'

সলোমনের ভুরু কুঁচকে উঠলো। 'কি বলছো?'

'কাউন্ট মাভো বুয়ার্দ,' বললো সলোমন। 'বুড়ো খোকা, নাহিদ তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। ওর সাথে আধ ঘণ্টা আগে কথা হয়েছে আমার, তুমি জানো?'

থপ্ করে জনির বুকের কাছে জ্যাকেট খামচে ধরলো সলোমন, হিড় হিড় করে টেনে বের করে আনলো প্যাসেজে, সেখান থেকে সোজা সেলুনে। ধাক্কা দিয়ে একটা চেয়ারে বসালো তাকে, চোখে আগুন নিয়ে জানতে চাইলো, 'একটা ফালতু কথা বললে জানে মেরে ফেলবো। সত্যি করে বল, নাহিদ তোর কাউন্টের পরিচয় জানে?'

'নিয়মই এই, মানুষের ভালো করতে চাইলে ভূতে কিলায়,' সলোমনের হুমকি সত্ত্বেও মিটিমিটি হাসছে জনি। 'হ্যাঁ, সলোমন, তোমার বন্ধু কাউন্টের নাম-ধাম সবই জানে। এমনকি

লণ্ডন ফ্রন্ট সম্পর্কেও জানে সে—ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট। আমার তো মনে হলো, কিছুই তার অজানা নেই।'

জনিকে ছেড়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সলোমন, চেহারা কালো হয়ে গেছে।

কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করলো জনি, 'তোমাকে সে অবিশ্বাস করে—নাহ্, তা কি করে হয়!'

কথাটা সলোমন শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কপালের পাশে একটা রগ বার-বার কেঁপে উঠলো। অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে। কম্প্যানিয়নওয়েতে তার পায়ের আওয়াজ হলো, ডেকে উঠে যাচ্ছে।

সশব্দে হাসতে শুরু করলো জনি, বাঁধা হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ানো, এই সময় গ্যালি থেকে কফি হাতে ভেতরে ঢুকলো রোয়েনা।

'প্যাঁচ লেগে গেছে, ঘুড়িতে ঘুড়িতে প্যাঁচ লেগে গেছে,' রোয়েনার দিকে তাকিয়ে বললো জনি। 'কোনটা কাটবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। কি গো, তোমার কি মনে হয়?'

পিছু হটে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রোয়েনা, চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ডেকে উঠে গেল সে।

সাথে সাথে হাসি থামালো জনি। ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে গ্যালিতে চলে এলো সে। সিঙ্কের পাশে কাটলারি ড্রয়ার, ভেতর থেকে দু'হাতে ধরে রুটি কাটার ছুরিটা বের করলো। উল্টো করলো ছুরিটা, হাতলটা দেরাজের ভেতর খাড়া করে রাখলো, তারপর

বন্ধ করলো দেরাজ। ফলাটা খাড়া হয়ে থাকলো, তার ওপর হাতের বাঁধন ঠেকিয়ে ঘষতে শুরু করলো সে। মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে এক করা কব্জি দুটো আলাদা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেলুনে ফিরে এলো সে। মেঝেতে হাঁটু রেখে নিচু হলো, বেঞ্চের নিচে হাত গলিয়ে লকার খুললো, লকারের পিছনের দেয়াল হাতড়ে ক্ষুদে বোতাম টিপে খুলে ফেললো গোপন কমপার্টমেন্ট। আবার যখন সিধে হলো, হাতে একটা স্টার্লিং সাব-মেশিন-গান রয়েছে। অ্যাকশন চেক করে হন হন করে এগোলো সে, কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এলো ডেকে।

রেইলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সলোমন, চোখে বায়নোকিউলার নিয়ে তীরে খুঁজছে রানাকে। হাতে কফির কাপ নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোয়েনা।

'মিঃ নাহিদকে দেখতে পাচ্ছো, জো?'

মাথা ঝাঁকালো সলোমন। 'এখনো তীরে রয়েছে সে। সম্ভবত ওপরে ওঠার পথ খুঁজছে।'

স্টার্লিং কক করলো জনি, পরিষ্কার ক্লিক আওয়াজ হলো। ঝট্ করে ঘুরলো সলোমন।

'চাইলে বীরত্ব দেখাতে পারো, বুড়ো খোকা,' মিটিমিটি হাসলো জনি। 'তবে বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

ছোট্ট একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ করে হাতের কাপটা ছেড়ে দিলো রোয়েনা, সলোমনের আস্তিন খামচে ধরলো।

'সর মাগী, সরে যা!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রোয়েনাকে ধাক্কা দিলো সলোমন। ডেকের ওপর আছাড় খেলো রোয়েনা।

'বেশ্যাটা আমাকে ঝালিয়ে মারলো!'

'মেজাজ খারাপ করো না, বুড়ো খোকা। লক্ষ্মী ছেলের মতো হুইলহাউসে চলো, বোট ঘোরাতে হবে।'

'কোথায় যাবো আমরা?' থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'সোজা হারবারে। বাড়িতে যখন তোমার বন্ধু উঠবে, ওখানে আমি হাজির থাকতে চাই। স্রেফ চেহারাটা কেমন হয় দেখার জন্যে।'

ডাইভিং ইকুইপমেন্ট খুললো রানা, পা থেকে রাবার ফিন নামালো, সবগুলো এক করে গুঁজে দিলো পাথরের একটা উঁচু ফাটলে। এতোটা উঁচুতে সাগর নাগাল পাবে বলে মনে হয় না।

টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে আছে পাহাড়ের গা, মাথার দিকটা কুয়াশায় ঢাকা। পাঁচিল কোথাও সবুজ, কোথাও কালচে সবুজ, বৃষ্টি আর পানির ঝাপটায় ভিজে চকচক করছে। ওর সামনের পাঁচিল একেবারে খাড়া, গা বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সরু সৈকত ধরে এগোলো ও, বোল্ডারগুলোকে পাশ কাটালো, টপকে গেল কোনো কোনোটা। এক জায়গায় কোমর সমান পানিতে নেমে পৈত্রিক প্রাণ রক্ষার জন্যে পাথর ধরে ঝুলে থাকতে হলো, আবার একবার ওকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো সাগর। এভাবে পনেরো মিনিট এগোবার পর এক জায়গায় থামলো রানা। এখানে পাঁচিলের গায়ে অনেক খাঁজ, গর্ত, আর সরু ফাটল রয়েছে, ওগুলোয় হাত-পা আটকে ওপরে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে।

উঠতে শুরু করার পর আর কোনো অসুবিধে হলো না। সরু একটা কার্ণিশ পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো মন। প্রায় খাড়া, তবে পাথরের খাঁজে হাত রেখে দ্রুত প্রায় অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এলো রানা। দম নেয়ার জন্যে এখানে থামলো ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সাগরের দিকে।

গোল্ডেন সান আছে কিনা বোঝা গেল না, গাঢ় কুয়াশায় সাগর ঢাকা পড়ে আছে।

আবার উঠতে লাগলো রানা। বৃষ্টি, বাতাস, শীত সত্ত্বেও আঁটসাট রাবার স্যুটের ভেতর ঘামছে ও। বাঁ হাতের ব্যথাটা খুব একটা বাড়েনি, তবে বিরতিহীন হয়ে উঠেছে। দু'একটা সেলাই কেটে যেতে পারে, রাবার কাফ-এর নিচে রক্তের একটা ধারা দেখতে পেলো ও। এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই।

পাঁচিলের কিনারা টপকে এসে ভিজে ঘাসে পড়ে থাকলো রানা। এক মিনিট পর ঘড়ি দেখলো। সাড়ে আটটা বাজে। আগে ভাবেনি এতো সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো ও। ঘাস মোড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

মাথায় উঠে এসে হঠাৎ পিঠ বাঁকা করে নিচু হলো রানা। ওর নিচে পঞ্চাশ ফিট গভীর আর দুশো ফিট ব্যাসের একটা গর্ত, ঠিক মাঝখানে একটা হেলিকপ্টার। গর্তের আরেক প্রান্তে সার সার পাইন গাছ, তবে বাড়িটা কোন্ দিকে বোঝা গেল না। তারপর মনে পড়লো রানার। ম্যাপে দেখেছে, দ্বীপের আরেক দিকে নামার সময় ঢালের গায়ে একটা গর্তের ভেতর রয়েছে বাড়িটা।

গর্তে নেমে এক ছুটে হেলিকপ্টারের কাছে চলে এলো রানা। পাশে লাগানো মই বেয়ে তর তর করে উঠলো, স্ক্রু ঘুরিয়ে খুলে ফেললো এঞ্জিনের ঢাকনি।

এঞ্জিন নষ্ট না করেও হেলিকপ্টার অচল করা সম্ভব, কিন্তু তাতে সময় অনেক বেশি লাগবে। ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে বড় একটা পাথর নিলো রানা, আবার মই বেয়ে উঠলো, তারপর ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে যে-ক'টা পার্টস ভাঙা সম্ভব সব ভাঙলো। বিশেষ করে ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেমটা চুরমার করে দিলো ও।

গর্ত থেকে উঠে পাইন বনে ঢুকলো রানা। ঢাল বেয়ে ছুশো গজ নামার পর আরেকটা গর্ত দেখা গেল। শেষ গাছটার আড়ালে থেকে উঁকি দিয়েও কোনো লাভ হলো না, গর্তের ভেতর বাড়িটা কোথাও দেখা গেল না। সরু একটা পথ বাঁ দিকে চলে গেছে, তারপর ঢাল বেয়ে নেমেছে গর্তের দিকে। সেটা ধরে ছুটলো রানা। গর্তের মুখে পৌঁছে দেখতে পেলো বাড়িটা।

এদিকের ঢালেও সার সার পাইন গাছ, এখানে সেখানে ঘন ঝোপ। অনেকটা নেমে এসে ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে থাকলো রানা। হাতে বেরিয়ে এসেছে অটোমেটিক। বাড়ির পিছনে লন, অনেক দিন যত্ন নেয়া হয়নি। একটা পাথুরে টেরেস, পাশাপাশি কয়েকটা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। সামান্য একটু খোলা রয়েছে একটার দরজা, লাল ভেলভেট পর্দার নিচের কোণ বাতাসে উড়ছে। ঝোপের আড়ালে থেকে খোলা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে এগোলো রানা। পর্দার জন্যে ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে

না। নিঃশব্দে টেরেসে উঠলো ও। পর্দাটা ধরে আস্তে করে সরালো একপাশে।

অন্ধকার কামরা। ভেতরে ঢুকলো রানা। তারপরই উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। পরমুহূর্তে ওর মাথার পাশে শক্ত, ধাতব কি যেন ঠেকলো।

পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওটা আমি নিচ্ছি, বুড়ো খোকা,' রানার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলো জনি।

ধীরে ধীরে আলোটা সয়ে এলো চোখে। রানা বাদে আরো পাঁচজন লোক রয়েছে কামরায়। ডান দিকে জনি, তার হাতে স্টার্লিং সাব-মেশিন গান। দরজার কাছে রয়েছে সলোমন আর রোয়েনা, ওদের পাহারা দিচ্ছে লম্বা, বাদামী, একহারা গড়নের এক যুবক। হাতে রিভলভার।

ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো একজন লোক। কালো হ্যাটের চওড়া কার্ণিশে পুরো কপালটাই তার ঢাকা। চোখে গাঢ় রঙের চশমা, আকারে এক একটা কাঁচ প্রায় পিরিচের মতো, প্রকাণ্ড মুখের বেশিরভাগটাই আড়াল করে আছে। হ্যাটের নিচে ঝুলে আছে চকচকে লম্বা কালো চুল—কান, ঘাড়, গলার দুই পাশ সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে। একটা কান থেকে সরু এক জোড়া তার বেরিয়েছে, সাদা, নেমে এসে ঢুকেছে ধূসর রঙের স্যুটের বুক পকেটে। চশমার কাঁচ এতো গাঢ় আর পুরু যে চোখ দেখার কোনো উপায় নেই। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলো রানা। ফ্রেমের এক কোণ থেকে সরু একটা অ্যান-টেনা কাত হয়ে আছে কানের দিকে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা। দৈহিক কাঠামোর সাথে মিলে যাচ্ছে, হ্যাট খুলে নিলে বেরিয়ে পড়বে মাথা ভর্তি এলোমেলো, ঝাঁকড়া চুল। হাঁটলে?

লোকটা রানার দিকে এগোলো।

হ্যাঁ, একটু খোঁড়াচ্ছে। একে অবশ্য ঠিক খোঁড়ানো বলে না, একটা পা একটু টেনে টেনে হাঁটছে। তবে কি···? কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব। কবীর চৌধুরী হয় কি করে!

'হ্যালো, মিঃ মাসুদ রানা,' পরিচিত কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো কামরার ভেতর, 'নাকি তোমাকে আমি মিঃ নাহিদ শাহ বলেই ডাকবো?' ভারি গলায় হাসলো লোকটা। 'স্বাগতম, স্বাগতম! ব্যাবিলনে স্বাগতম!' পরিষ্কার বাংলা।

এগারো

ভিড় ঠেলে সামনে বাড়ার চেষ্টা করলো সলোমন, বিমূঢ় চেহারা। 'এ-সবের মানে কি?'

'হ্যাঁ,' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কবীর চৌধুরী, 'তোমার বিস্মিত হবারই কথা। তুমি যাকে আফগান যুবক নাহিদ শাহ বলে চেনো সে আসলে নাহিদ শাহও নয়, ভাড়াটে সৈনিকও নয়, ডাকাত তো নয়ই। পুলিশ বললে ওকে চিনতে সুবিধে হবে তোমার, যেহেতু তুমি চোর। ফ্রাইডেথর্পে তোমার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিলো ওর ওপর। শুধু তাই নয়, আবার তোমাকে জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও ওর দায়িত্বের একটা অংশ।'

'পুলিশ?' হাঁ হয়ে গেল সলোমন। 'ও?' বেসুরো গলায় হাসলো সে। 'অসম্ভব। পুলিশের গন্ধ আমি এক মাইল দূর থেকে পাই। ও যদি পুলিশ হয় আমি তাহলে গিরিগিটির লেজ।'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হলে খুশি হও? কিংবা এসপিওনাজ এজেন্ট?' সলোমনের চেহারায় দিশেহারা ভাব ফুটে উঠছে

দেখে ভরাট গলায় হাসলো কবীর চৌধুরী। তারপর লম্বা, ঋজু যুবকের দিকে ফিরলো সে। 'হরি, মাই ডিয়ার বয়, সলোমন আর মেয়েটাকে নিচে সেলারে নিয়ে যাও। আমি চাই তারপর তুমি হেলিকপ্টার রেডি করে খবর দেবে। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা।'

'কিন্তু শুনুন···,' শুরু করলো সলোমন, এমনি সময়ে তার দিকে এক পা এগিয়ে হাতের রিভলভারটা বুক বরাবর তাক করলো হরি।

'হরিকে মাফ করতে হবে,' বললো কবীর চৌধুরী। 'আমাকে একটা এক্সপেরিমেন্টে সাহায্য করতে গিয়ে বেচারা তার বাক, স্মৃতি, বিবেক, এবং বিবেচনা শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। শুধু আমাকে চেনে ও, আমার কথা শোনে। যদি বলি নিজের মাথায় গুলি করো, এখুনি তা করবে ও। ও যে বিপজ্জনক, তা কি আরো ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার আছে? তোমার জায়গায় আমি হলে ও যা বলে শুনতাম।'

তিনজন বেরিয়ে গেল কামরা থেকে, তাদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'এতো হৃদয়হীন হও কি করে, জনি?' মৃদু হেসে বললো কবীর চৌধুরী। 'দেখছো না, রানা কেমন টেনশনে রয়েছে? ওকে একটা সিগারেট তো অন্তত দাও।'

'এই যে, বুড়ো খোকা,' বলে রানার দিকে লাইটার আর সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলো জনি।

সিগারেট ধরালো রানা, লক্ষ্য করলো হাত দুটো একটু একটু

কাঁপছে ওর। কাছ থেকে দেখার পর ওর মনে হলো, কবীর চৌধুরীর মুখের রঙ একটু যেন বেশি মসৃণ, রঙটাও কেমন যেন উজ্জ্বল। সম্ভবত অতি সূক্ষ্ম কৃত্রিম কোনো চামড়া দিয়ে গোটা মুখ আড়াল করা হয়েছে।

'আমরা প্রফেশনাল, তাই না, রানা?' জিজ্ঞেস করলো কবীর চৌধুরী। 'কাজেই এসো কাজের কথাগুলো চটপট সেরে ফেলি। তার আগে তোমার একটু প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। জেলে ঢোকার কৌশলটা সত্যি সুন্দর ছিলো। ডাকাতিটা একেবারে নিখুঁত হয়েছিল।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা। 'কিন্তু তোমার কৃতিত্বের কাছে আমারটা ছেলের হাতের মোয়া। আমি হয়তো অনেক কিছু পারি, কিন্তু মরে গিয়ে ফিরে আসতে পারি না।'

'আসলে আমার তেমন কোনো কৃতিত্ব ছিলো না, অ্যাণ্ড দ্যাটস আ ফ্যাক্ট। সব কথা জানলে তুমিও আমার সাথে একমত হবে।'

অকপটে স্বীকার করলো রানা, 'জানার জন্যে আমি মরে যাচ্ছি।'

ঘুরে চেয়ারে গিয়ে বসলো কবীর চৌধুরী। রানা লক্ষ্য করলো,

খানিক আগে পৌঁছায়নি। তাহলে একটা হাত, চোখ, মুখের একটা পাশ, ইত্যাদি আমাকে হারাতে হতো না।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকলো রানা। 'তুমি বলতে চাইছো···!'

'তবে লাভও কম হয়নি,' বললো কবীর চৌধুরী। 'চোখ হারিয়ে আমি বেশি দেখতে পাচ্ছি, যে-কোনো মানুষের চেয়ে অনেক বেশি,' চশমার ফ্রেমে আঙুল তুললো সে। 'এটা আসলে একটা ক্যামেরা। আমার সামনে যা যা আছে তার কিছুই আমি দেখতে পাই না, দেখতে পাই ওগুলোর রঙিন ছবি। টেকনিক্যাল ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে। সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলবো : অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের সাথে দেহের ইন্দ্রিয়গুলোর সংযোগ ঘটানো সম্ভব হওয়ায় বিস্ময়কর রেজাল্ট পাচ্ছি। চামড়ার চোখ অনেক জিনিস দেখেও না দেখতে পারে, কিন্তু একটা ক্যামেরা কিছু বাদ না দিয়ে সমস্ত কিছুর ছবি তোলে। কৃত্রিম কানে আমি যা শুনি তোমরা তা শোনো না। বর্তমানে সারা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসম্যান কে বলো তো? আমি। কারণ আমার কৃত্রিম ডান হাত শুধু কাঁপে না তাই নয়, ওটার সাথে ক্যামেরা, রাডার, টেলিস্কোপ ইত্যাদি ফিট করা আছে।

খোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হলো রানার। তাছাড়া, কবীর চৌধুরী যে বেঁচে তা তো আর মিথ্যে নয়। শুধু ব্যাপারটা হজম করতে সময় নিলো ও। বললো, 'কংগ্রাচুলেশন্স!'

রাবারের মতো প্রসারিত হলো কবীর চৌধুরীর পুরু ঠোঁট। 'ধন্যবাদ।' চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না, তবে পরিতৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

'তোমার অর্গানাইজেশনটা কিন্তু বেশ শক্তিশালী, ব্যবসাও বেশ ভালো ফেঁদেছো,' বললো রানা।

হা হা করে হাসলো কবীর চৌধুরী। বিনয়ের সাথে বললো, 'ও কিছু না। আমরা আমাদের মক্কেলকে বেস্ট সার্ভিস দেয়ার চেষ্টা করি, এই আর কি।'

'সার্ভিসই বটে,' ব্যঙ্গ করলো রানা। অপেক্ষা করছে হাসানের প্রসঙ্গ কখন তুলবে কবীর চৌধুরী। 'জন হেরিক আর রিড কোয়েনের মতো কতো বোকা যে তোমার বেস্ট সার্ভিস পেয়ে অকালে স্বর্গে গেল। এমন লোভে ফেলো ওদের, টাকার হদিশ জানিয়ে দিতে কেউ একটুও আপত্তি করে না।'

'ভাবতে অবাক লাগে, প্রফেশনাল ক্রিমিনালদের মতো হাবা-গোবা লোক হয় না। মিথ্যে গল্প বিশ্বাস করার ব্যাপারে ওদের জুড়ি মেলা ভার। অল্প জলের মাছ—শুধু টোপ নয়, হুক, লাইন, সীসা, ফাতনা পর্যন্ত সব গিলে ফেলে।'

'আর যাদের অন্য দেশে পাচার করো?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'রাশিয়ায়? ইসরায়েলে? দেশ বদলের পর তারাও কি অকালে মারা যায়?'

'ওরা বেশিরভাগই নিজেরা বিক্রি হয়ে যায়,' বললো কবীর চৌধুরী। 'আমার কাজ হলো নতুন মালিকের কাছে ওদের পৌঁছে দেয়া। সময়, কৌশল, বাহন, ইত্যাদি ঠিক করি আমি। তারপর

কি হয় না হয় আমি কি করে বলবো।'

'বোঝাই যায়, আমি আসছি এ খবরটা তুমি দেরি করে পেয়েছো, নাকি আমার ধারণা ভুল?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'জানতাম আসবে,' ভরাট গলায় হাসলো কবীর চৌধুরী 'কিন্তু নাহিদ যে মাসুদ রানা সেটা বুঝতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তবে যখন শুনলাম হাসপাতাল থেকে দু'জন পালিয়েছে, তখনই আন্দাজ করলাম ওদের একজন তুমি।'

তিক্ত একটু হাসলো রানা, কথা বললো না।

'তুমি ভাবছো, তোমার জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করিনি কেন। করিনি, কারণ জানতাম, কোনো স্টেশনেই ওরা তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না। এই সুযোগে স্টেশনগুলোর শক্তি পরীক্ষাও হয়ে গেল। হোফার টুইড, রুথ ব্ল্যানশি, এভ নিকলস বা জনি তোমার ব্যবস্থা করতে পারেনি, কিন্তু আমি পারতাম।'

প্রসঙ্গটা নিজেই তুললো এবার রানা, 'কিন্তু হাসানকে এখান পর্যন্ত আসতে দেয়ার পিছনে কি কারণ ছিলো?'

'জেল থেকে বের করা হলো তাকে, তারপরই ধরা পড়ে যেন জনিকে নির্দেশ দিলাম তাকে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কৌতূহল বলতে পারো, আবার ফাঁদও বলতে পারো।'

'কি রকম?'

'কৌতূহল ছিলো, রানা এজেন্সি আমার সম্পর্কে সব কথা জানে কিনা। ফাঁদ এই জন্য যে জানতাম হাসান নিখোঁজ থাকলে তার পথ ধরে আসবে তুমিও। তোমাকে হাতে পাওয়া আমার দরকার ছিলো। ছোট্ট একটা হিশেব মেলানো বাকি আছে না?'

'কোথায় রেখেছো তাকে?' কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আশ্চর্য, দেখেও চিনতে পারোনি? সত্যিই পারোনি? তাহলে তো নিজের খানিকটা প্রশংসা করতে হয়।'

ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার। 'হাসানকে দেখেছি? কোথায়?'

'কেন, এখানে। ওর নাম অবশ্য বদলে দিয়েছি আমি। হরি—ছোটো নামই আমার পছন্দ।'

ছ্যাঁৎ করে উঠলো রানার বুক। প্রচণ্ড অবিশ্বাসে বোবা বনে গেল ও। প্রায় ষাট সেকেণ্ড পর চিৎকার করে উঠলো, 'অসম্ভব! হাসান···' হাসানের চেহারা···

'প্লাস্টিক সার্জারী, রানা,' তৃপ্তির হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'এ তো কিছুই নয়, চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছি আর কি কি করেছি তা তো তোমাদের আগেই বলেছি।'

'অসম্ভব!' বিড়বিড় করে বললো রানা। 'আমি বিশ্বাস করি না। হরি—হাসান? মাই গড, নো!'

'ইয়েস।'

যেন ধমক খেয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র রানা হেড স্যারের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো।

'এবার জানো, কেন ওকে হরি বানিয়েছি?' গমগম করে উঠলো কবীর চৌধুরীর ভারি কণ্ঠস্বর। 'প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। তুমি আমার চিরশত্রু, রানা। তোমার শিষ্যকে দিয়েই তোমার জীবনলীলা সাঙ্গ করাবো আমি।'

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো রানা।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো কবীর চৌধুরী। 'কেমন মজা হবে ভাবতেও আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। কানে শোনে, কিন্তু বিবেক নেই, দেখতে পায়, কিন্তু চিনতে পারে না। হাসান-হাসান করে যতোই চেঁচাও, কিছু মনে করতে পারবে না। ছুটো মাত্র শব্দ—ব্রেন ওয়াশ, কিন্তু কি ভয়াবহ তার তাৎপর্য, তাই না? হ্যাঁ, আমি ওর ব্রেন ওয়াশ করেছি। ও শুধু আমাকে চেনে। আমি যা বলবো তাই করবে। এবং আমি ওকে বললো, হরি, মাসুদ রানা লোকটা আমার প্রাণের শত্রু, ওকে তুমি খতম করো।'

গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল রানার। 'তুমি একটা পাগল। তু-তুমি একটা উ-উন্মাদ…,' প্রচণ্ড উত্তেজনায় তো তলাতে শুরু করলো রানা।

'এবার আমাকে ক্ষমা করতে হবে,' শান্ত গলায় বললো কবীর চৌধুরী। 'কিছু প্রস্তুতি নেয়া বাকি আছে, এখুনি না সারলে রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে,' জনির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো সে। 'ওকে তুমি ওদের কাছে নিচে নিয়ে যাও, জনি। তারপর এখানে ফিরে এসো।'

'সলোমন আর রোয়েনা, ওদের কি হবে?' পিঠে সাবমেশিন-গানের স্পর্শ নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ওদেরও ব্যবস্থা হবে, কথা দিলাম।'

রানার পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে এসে জনি বললো, 'মনটা শক্ত করো, বুড়ো খোকা। কথা দিচ্ছি, ওরা বেশি ব্যথা পাবে না।'

ঠেলে রানাকে সেলারের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো জনি। প্রায় অন্ধকারই বলা যায়, উল্টো দিকের একটা ফোকর থেকে এক ফালি আলো ঢুকেছে। ওটা দিয়ে একটা বিড়াল ঢুকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

রানার পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সামনে খস খস আওয়াজের সাথে কি যেন নড়ে উঠলো। তারপর সলোমনকে দেখতে পেলো ও, এগিয়ে আসছে সে। 'কে ওখানে?'

'আমি—রানা।'

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল সেলার, আচমকা একটা ঘুসি আসার অপেক্ষায় থাকলো রানা। কিন্তু এলো না। বিষণ্ণ সুরে কথা বললো সলোমন, 'কাউন্ট লোকটা তোমার সম্পর্কে যা যা বললো, সব সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

রানার দিকে পিছন ফিরলো সলোমন। তারপর বিস্ফোরিত হলো সে। 'আমি, জো সলোমন, ব্লাডি একটা পুলিশের ফাঁদে পড়েছি!'

রানা বলতে পারে, সাথে ও না থাকলে ওয়াইকেহেড ফার্ম-হাউসের কুয়ায় পটল তুলতো সলোমন। কিন্তু বলে কোনো লাভ নেই।

'সত্যি যদি জানতে চাও তো শোনো,' বললো রানা। 'আমি পুলিশ নই। জন হেরিক, রিড কোয়েন, বা তোমার ব্যাপারেও আমার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। রিপ হটনের ব্যাপারে আছে। কারণ রিপ হটন জেল থেকে বেরোয়নি, তার বদলে

বেরিয়েছে আমার এজেন্সির একজন এজেন্ট। আমি তাকে উদ্ধার করতে এসেছি। আর কাউন্টের কথা যদি বলো, জেল খানা থেকে কয়েদী বের করে মেরে ফেলাই তার একমাত্র কাজ নয়, ইংল্যাণ্ডের টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট অন্য দেশে বিক্রি করে সে, বিশ্বাসঘাতকদের পাচার করে নিরাপদ আশ্রয়ে। তার ঠিকানা আর পরিচয় জানার জন্যেই তোমার সাথে ভিড়তে হয়েছিল আমাকে।'

'তারমানে আমাদের সরকারও তোমাকে সাহায্য করছে,' বললো সলোমন। 'তার অর্থই হলো, আবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ফ্রাইডেথর্পে, নাকি তোমার ইচ্ছে আমাকে ছেড়ে দেবে?' আবার রানার দিকে ফিরলো সে।

'এ-ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আমি নই।'

'মাই গড, তোমার জন্যে এতো কিছু করার পর শেষ পর্যন্ত এই কথা শুনতে হচ্ছে!' রাগে কাঁপতে শুরু করলো সলোমন। এক কোণ থেকে এগিয়ে এসে তার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো রোয়েনা।

'শান্ত হও, জো, শান্ত হও...।'

হিংস্র আক্রোশে রোয়েনার দিকে ফিরলো সলোমন, দু'হাত তুলে সজোরে ধাক্কা দিলো বুকে, ছিটকে দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়লো মেয়েটা। 'বেশ্যা মাগী! কাছে আসবি তো মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলবো।'

ব্যথায় উঁ-আঁ করতে করতে বেঞ্চে উঠে বসলো রোয়েনা। সিগারেট ধরালো রানা। 'ওকে মারধর করলে কি সমস্যার

সমাধান হবে ?'

'এতোই যদি দরদ, কোলে তুলে আদর করো, যাও।' ফুঁসে জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সলোমন। তারপর হঠাৎ ঘুরলো। 'কি ঘটবে এখন ? তোমাকে কোনো আভাস দিয়েছে ?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো রানা। 'আভাস দেয়ার দরকার আছে কি ? আর সবাইকে নিয়ে যা করে এসেছে, আমাদের নিয়েও তাই করবে।'

'আমি হয়তো কাউন্টের সাথে একটা চুক্তিতে আসতে পারি,' ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে বললো সলোমন।

'কি দিয়ে ? তোমার ডায়মণ্ডগুলো তো তার হাতে। কি তোমার দেয়ার আছে তাকে ?'

'নিশ্চয়ই কোনো একটা সমাধান বের করা যাবে।' উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলো সলোমন।

সলোমনকে পাশ কাটিয়ে গেল রানা, জানালার কার্ণিশ ধরে উঁচু করলো মাথা, উঁকি দিয়ে নিচে তাকালো। উঠন দেখা গেল। হঠাৎ পাইন গাছের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখলো হরি—অর্থাৎ হাসানকে। চোখের পলকে বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মেঝেতে নেমে মৃদু হাসলো রানা। 'কিছুটা অ্যাকশন দেখার সুযোগ হবে বলে মনে হচ্ছে।'

তিন কি চার মিনিট পর পায়ের আওয়াজ পেলো ওরা। পর-মুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। এক ঝলক আলোর সাথে জনিকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। মেশিনগান রেখে পয়েন্ট থ্রি

এইট রিভলভার নিয়ে এসেছে সে। আশ্চর্য, তার চেহারায় কৌতুকের হাসি। 'এই যে, বুড়ো খোকা, তোমার কি একটু সময় হবে?' রানাকে জিজ্ঞেস করলো সে। 'মহামান্য কাউন্টের সাথে দেখা করলে কৃতার্থ হবেন তিনি। তবে খুব সাবধান—মহামান্য বড় অস্বস্তির মধ্যে আছেন।'

চট্ করে একবার ঘড়িটা দেখে নিলো রানা। প্রায় ন'টা বাজে দেখে আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালো ও। 'আমার সময় মানে তোমাদের সময়। এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু করারও নেই আমার। এতো করে যখন বলছো, চলো যাই, দেখি মহামান্যের কি বলার আছে।' সলোমনের দিকে ফিরলো রানা, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে না ফিরলে ছেড়ে দিয়ো কুকুরগুলোকে।'

কিন্তু রানার অসময়োচিত রসিকতায় সাড়া দিলো না সলোমন, ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজের সাথে ঘুরে দাঁড়ালো সে। অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে সেলার থেকে বেরিয়ে এলো রানা। পিছু পিছু এলো জনি আর তার রিভলভার।

ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে হাসানের সাথে কথা বলছে কবীর চৌধুরী। রানাকে নিয়ে জনি ঢুকতেই ঝট্ করে ঘুরলো সে। মানুষটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী। 'হরির কাছে শুনলাম হেলিকপ্টারের এঞ্জিন ভেঙে ফেলা হয়েছে। কাজটা নিশ্চয়ই তোমার?'

'বলো কৃতিত্বটা।'

'কাজটা তুমি ভালো করোনি, রানা,' ঠাণ্ডা গলায় বললো কবীর চৌধুরী।

কামরার এক কোণে ছোট্ট একটা বার, কারো অনুমতির ধার না ধেরে সেদিকে এগোলো রানা। জনির হাতে রিভলভারের মাজ্‌ল্ ধীরে ধীরে ঘুরে গেল। বারের সামনে দাঁড়ালো রানা, সরু একটা গ্লাসে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেললো। তারপর এগিয়ে এসে আবার নিজের জায়গায়, কবীর চৌধুরীর সামনে দাঁড়ালো। 'এখনো বুঝতে পারছো না?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'মানে?'

হাসলো রানা। 'কোথাও তুমি যাচ্ছো না, কবীর চৌধুরী। তোমার যাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তুমি শেষ হয়ে গেছো। কাল রাতে আপটন মাগনা থেকে রওনা হবার আগেফোনে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সাথে কথা হয়েছে আমার। লম্ব পিয়েরের কথা বললাম ওদের, চেক করলো ওরা, বেরিয়ে এলো তোমার পরিচয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সবার টনক নড়লো। তোমার লণ্ডন ফ্রন্ট ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে দেখো না—কেউ সাড়া দেবে না। অফিস আজ খোলাই হয়নি।'

জনির দিকে ফিরলো কবীর চৌধুরী। 'তোমার ধারণা ও সত্যি কথা বলছে?'

'সম্ভাবনা খুব বেশি।'

'তারমানে ওর বন্ধুরা যে-কোনো মুহূর্তে হাজির হতে পারে।'

'ঠিক,' স্মিত হেসে বললো রানা। 'কার্টসি অভ দ্য রয়্যাল নেভী।'

কবীর চৌধুরী শ্রাগ করলো। 'পরিস্থিতি সত্যিই ঘোলাটে। কিন্তু গুরুতর নয়। অত্যন্ত স্পীডি বোট রয়েছে হাতে। রওনা হবার দশ মিনিটের মধ্যে ফ্রেঞ্চ সমুদ্র-সীমায় পৌঁছে যাবো আমরা।'

ধ্বক করে উঠলো রানার বুক। শয়তানটা বুঝি আবার আঙুল গলে পালাবে। মাথার ভেতর ঝড় বইতে শুরু করলো। জনি বোট চালাতে জানে না, সি-সিকনেসে কাহিল হয়ে পড়ে। হাসান-ও বোট সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। কিন্তু কবীর চৌধুরী পাকা নাবিক। বার-এর দিকে আবার একবার এগোলো রানা।

'টেনশন বেড়ে গেল নাকি?' হেসে উঠলো কবীর চৌধুরী।

গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ঘুরলো রানা, বললো, 'চেষ্টা করে দেখতে পারো, কিন্তু লাভ হবে না। ফ্রেঞ্চ কোস্টগার্ড এবং পুলিশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।'

'কোথাও কোনো ফাঁক রাখোনি দেখছি,' বলে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে এগোলো কবীর চৌধুরী। আহত বাঁ হাতে গ্লাস নিয়ে রানাও সেই মুহূর্তে এগোলো। দু'জনের একজনকে থামতে হবে, তা না হলে ধাক্কা লাগবে গায়ে গায়ে। রানাই থামলো, পর-মুহূর্তে ওর ডান হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কবীর চৌধুরীর চশমাটা ধরে সজোরে টান দিলো ও, টিং টিং আওয়াজের সাথে ছিঁড়ে গেল কয়েকটা তার। মেঝেতে আছড়ে ফেলে পায়ের চাপে ভেঙে চুরমার করে ফেললো। ধীরে ধীরে সিধে

হলো রানা, পাঁজরে জনির রিভলভার চেপে বসে আছে। ওদিকে ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠেছে কবীর চৌধুরী, দু'হাতে চোখ ঢেকে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে।

'আমার চশমা···।'

'দেবো শেষ করে, মহামান্য কাউন্ট?' হিসহিস করে জানতে চাইলো জনি।

'আমার চশমা···।' হুংকার ছাড়লো কবীর চৌধুরী।

'শয়তানটা ভেঙে ফেলেছে, স্যার,' বললো জনি। 'একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল কবীর চৌধুরী। ঝাড়া পনেরো সেকেণ্ড এক চুল নড়লো না সে। তারপর ক্ষীণ একটু হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে, আঙুলের ফাঁকে ঠোঁট জোড়া প্রসারিত হতে দেখলো রানা।

'তুমি চাও না আমি বোট চালাই,' হাসতে হাসতে বললো কবীর চৌধুরী। 'তারমানে ফ্রেঞ্চ কোস্টগার্ড বা পুলিশকে সতর্ক করা হয়নি, তাই না?' জনির উদ্দেশে বললো, 'ডাকাত-টাকে নিয়ে এসো এখানে, জনি। জলদি। নষ্ট করার মতো সময় নেই। হরি, রানার ওপর নজর রাখো।' পকেট থেকে রিভলভার বের করে রানার দিকে তাক করলো হাসান।

মনে মনে নিদারুণ হতাশ হলো রানা। কাজটায় কোনো লাভ হলো না। কবীর চৌধুরী এখন বোট চালাতে পারবে না, কিন্তু সলোমন পারবে। তবু জোর গলায় বললো ও, 'চেষ্টা করে দেখতে পারো, কিন্তু তোমার পালাবার কোনো উপায় নেই।'

তিন মিনিট পর কামরায় ঢুকলো সলোমন, পিছনে জনি। সলোমনকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখালো।

'সলোমন, এইমাত্র আমি জানতে পারলাম রানার লোকজন যে-কোনো মুহূর্তে দ্বীপে হানা দিতে পারে,' বললো কবীর চৌধুরী।

'আপনার মন্দ কপাল।'

'তোমারও—নাকি ফ্রাইডেথর্পে ফিরে গিয়ে আরো পনেরো বছর কাটাতে চাও?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সলোমন জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে ডেকে পাঠাবার কারণ কি?'

'আমি জানি, এক সময় টর্পেডো বোটে পেটি অফিসার ছিলে তুমি,' বললো কবীর চৌধুরী।

'তো কি হয়েছে?'

'দুর্যোগের মধ্যে গোল্ডেন সানকে নিরাপদে ইংল্যাণ্ড থেকে নিয়ে এসেছো তুমি, এতে তোমার যোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। চেষ্টা করলে বোটটা তুমি পর্তুগালে নিয়ে যেতে পারবে না?' রানার দিকে ফিরলো কবীর চৌধুরী। 'আমি জানি, বোটটা লাইবেরিয়া-য় রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। কাজেই রয়্যাল নেভি গোল্ডেন সানে উঠতে চেষ্টা করলে সেটা সম্পূর্ণ বেআইনী একটা কাজ হবে।'

'গোল্ডেন সানের রেঞ্জ মাত্র ছশো মাইল,' বললো সলোমন। 'বাকি দুই কি তিন শো মাইলের জন্যে অতিরিক্ত ফুয়েল লাগবে।'

'বিশ গ্যালনের কয়েকটা ড্রাম রয়েছে জেটির পাশে, চলবে ?'

'তা চলবে—কিন্তু আমার কি লাভ ? আমি কি পাবো ?'

'পাবে মুক্তি, পাবে ডায়মণ্ডের অর্ধেক ভাগ। তাঞ্জিয়ার্সে নতুন একটা অর্গানাইজেশন গড়ছি আমি, সেখানে লোভনীয় একটা চাকরিও পেতে পারো। বলো, আর কি চাও ? তোমাকে সাথে পেলে ব্যবসা আমার তুঙ্গে উঠবে, কোনো সন্দেহ নেই।'

'ওর কথা শুনো না, সলোমন,' বললো রানা। 'এরকম একটা বোট নিয়ে বে অভ বিসকে পেরোনো অসম্ভব। অন্তত বছরের এই সময়টায় কোনোমতেই পারবে না।'

'কে বললো পারবো না ?' রানার দিকে তাচ্ছিল্যের হাসি ছুঁড়ে জিজ্ঞেস করলো সলোমন। 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, ফ্রাইডেথর্পে ফিরে যাবার চেয়ে বোট নিয়ে সাগরে ডুবে যাবো।' কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরলো সে। 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করবো কিভাবে ?'

মুখ থেকে ডান হাতটা নামিয়ে স্যুটের পকেটে ভরলো কবীর চৌধুরী। হাতটা বেরিয়ে এলো একটা ল্যুগার নিয়ে। সেটা বাড়িয়ে ধরে বললো সে, 'এটা কি বিশ্বাসের একটা সন্তোষজনক নমুনা হতে পারে না ?'

ল্যুগারটা নিয়ে ফায়ারিং মেকানিজম পরীক্ষা করলো সলোমন, সন্তুষ্টচিত্তে ঘাড় ঝাঁকালো। 'ঠিক আছে, তাহলে আর দেরি কিসের ? ড্রামগুলো তুলতে হবে না ?'

ওপর-নিচে মাথা দোলালো কবীর চৌধুরী। তারপর রানাকে বললো, 'চশমা ভেঙে আপাতত আমাকে অন্ধ করে দিয়েছো,

কিন্তু তুমিও জানো আরেকটা বানিয়ে নিতে পারবো। কোনো লাভ হলো কি?' রানা কিছু বলার আগেই জনিকে বললো সে, 'ওকে মেয়েটার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, জনি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, ঘরটা খালি করার জন্যে তোমাকে এখানে দরকার হবে। সলোমনের সাথে হরি যাক, ড্রাম তুলতে সাহায্য করবে।'

'আমাদের নিয়ে কি করা হবে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

মিটিমিটি হেসে জনি বললো, 'ভেবেচিন্তে কিছু একটা ঠিকই বের করে ফেলবো, বুড়ো খোকা।'

পিঠে ধাক্কা খেয়ে দরজার দিকে এগোলো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে সলোমনের দিকে একবার তাকালো ও। বললো, 'ওরা আমাদের খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে, সলোমন। তুমি জানো।'

'সে তোমাদের মন্দ কপাল।'

'রোয়েনার ব্যাপারে তোমার কিছু বলার নেই?'

'আমাদের সাথে তার আসাই উচিত হয়নি। আমি সেধে-ছিলাম?'

'এই তোমার শেষ কথা?'

রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়ালো সলোমন, একটা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। তার পিছু নিলো হাসান।

রানা ডাকলো, 'হাসান, দাঁড়াও!'

হাসান ফিরেও তাকালো না, যেন রানার ডাক শুনতেই পায়নি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কবীর চৌধুরী। হাত দিয়ে

এখনো চোখ ঢেকে আছে সে। 'দুঃখজনক, তাই না?' হাসলো সে। 'কিন্তু একেই বলে কঠিন বাস্তবতা, মেনে না নিয়ে উপায় নেই।'

'কিন্তু তারও চেয়ে দুঃখজনক, আসলে মানুষ যা বোনে তাই তোলে ক্ষেত থেকে,' বলে ঘুরলো রানা, বেরিয়ে এলো কামরা থেকে। রিভলভার হাতে পিছনে থাকলো জনি।

বারো

রানার পিছনে দরজা বন্ধ হতেই আলুথালু বেশে ছুটে এলো রোয়েনা। 'জো কোথায়? তাকে কেন আটকে রাখলো ওরা?'

'সলোমন ভালো আছে,' বললো রানা। 'জেটিতে গেছে ও।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রোয়েনা। 'কি বলছেন?'

রোয়েনাকে ধরে বেঞ্চের ওপর বসিয়ে দিলো রানা। 'ওরা চলে যাচ্ছে, রোয়েনা। ওদের সাথে সলোমনও যাচ্ছে। বোট চালাবার জন্যে তাকে ওদের দরকার।'

'কিন্তু আমার কি হবে?' অস্থির হয়ে উঠলো রোয়েনা। 'আমাকে নিশ্চয়ই ও ফেলে যাবে না! বলেছে আমাকে নিয়ে যাবে?'

'তোমাকে তো আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছি, শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দেয়ার কি মানে!'

সটান উঠে দাঁড়ালো রোয়েনা। 'ওরা ওকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না?' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো সে। 'এখন

তাহলে কি করা যায়, মিঃ নাহিদ ? কিছু তো একটা করতেই হবে, তাই না ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকলো রানা। ঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। সাড়ে ন'টা বাজতে চলেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বেঞ্চে বসলো ও।

একটু পরই জনি আসবে। নাকি হাসানকে পাঠাবে কবীর চৌধুরী ? হ্যাঁ, তাই বলেছে সে। কিংবা হাসান এবং জনি দু'-জনেই আসবে। জানা কথা, ওদের খুন করতে আসবে ওরা। অথচ এই মুহূর্তে কিছুই ওর করার নেই। গোটা ব্যাপারটা হিম-শীতল দক্ষতার সাথে সারবে ওরা, কোথাও এক চুল ভুল করবে না। ব্রেন ওয়াশের পর হাসানকে আর সুস্থ মানুষ বলা যায় না, কবীর চৌধুরীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে সে। আর জনি তো বরাবরই একটা বিবেকহীন পশু, প্রফেশনাল খুনী। কিন্তু এ-সব কথা রোয়েনাকে বলার কোনো মানে হয় না।

বিশ মিনিট পর আওয়াজ। বোল্ট খোলার শব্দ। কবাট উন্মুক্ত হলো। দোরগোড়া থেকে অনেকটা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে হাসান। হাতের রিভলভার নেড়ে ওদেরকে বাইরে বেরুতে ইঙ্গিত করলো সে।

সামনে এগোলো রানা, সাথে সাথে ওর বুক লক্ষ্য করে রিভল-ভার তুললো হাসান। 'আমাকে তুমি চিনতে পারছো না, হাসান ?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা। লক্ষ্য করলো, হাসানের চেহা-রায় কোনো ভাব নেই। পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ্য স্থির করছে হাসান, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল,

আঙুলের ডগা সাদা হয়ে গেছে।

মাথার ওপর তাড়াতাড়ি হাত তুলে রানা বললো, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, উত্তেজিত হয়ো না। কিন্তু আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো কিনা বলো। আমি মাসুদ রানা, রানা এজেন্সির মাসুদ ভাই, তোমার বস। মনে পড়ে, তোমার স্ত্রীকে ডেলিভারির সময় গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম? রক্ত পাওয়া যাচ্ছিলো না, আমি রক্ত দিয়েছিলাম?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো হাসান, কিন্তু চোখ বা চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না। ট্রিগারে তার আঙুলের দিকে চোখ রেখে মনে মনে প্রমাদ গুণলো রানা। যে-কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে পারে গুলি।

'ঠিক আছে, চলো কোথায় যেতে হবে।'

পিছন থেকে রানার কাঁধ খামচে ধরলো রোয়েনা, ব্যথা পেলো রানা। 'এসব কি ঘটছে, মিঃ নাহিদ? ও আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?'

রিভলভার নেড়ে আবার ওদেরকে কামরা থেকে বেরুবার ইঙ্গিত করলো হাসান।

'জানি না,' বললো রানা। 'এসো, দেখা যাক কি হয়।'

বেসমেন্ট থেকে ওপরে উঠে এলো ওরা। ওদের বেশ খানিকটা পিছনে থাকলো হাসান। রানার মনে হলো সব কিছু যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘটতে দেখছে ও। হাসান, ওর প্রিয় সহকারীদের একজন, ওকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস করতে মন চায় না, কিন্তু বাস্তব সত্য। যাকে বাঁচাতে এতো কষ্ট করে এতদূর এসেছে,

তারই হাতে খুন হতে হবে ওকে !

'তুমি জানো, তোমাকে রেখেই ওরা চলে যাবে। না ?' ঘাড় ফিরিয়ে হাসানকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

হাসান নির্লিপ্ত, যেন কানেও কিছু শোনে না সে।

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। এখনো গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। লন পেরোলো ওরা। সার সার পাইন গাছ আর ঝোপগুলো কেমন স্থির, যেন শোকে মুহ্যমান। বৃষ্টি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। দূর থেকে ভেসে আসা সাগরের গর্জন ভোঁতা লাগছে কানে। জঙ্গলে ঢুকলো ওরা। নিচে নেমে আসা শাখা-প্রশাখা এড়িয়ে এগোলো ছোট্ট দলটা। একজন মারবে, দু'জন মরবে।

রোয়েনা কোঁপাচ্ছে। বারবার হোঁচট খেলো সে। কপালে কি আছে টের পেয়ে গেছে। সান্ত্বনা দেয়ার ইচ্ছে জাগলো মনে, কিন্তু উৎসাহ পেলো না রানা। তার পিছনে রয়েছে ও। সবশেষে হাসান, হাতে রিভলভার রানার পিঠের দিকে ধরা।

মোটা একটা ডাল ধরে সরালো রোয়েনা, ভিজে ঘাসে সাবধানে পা ফেলে এগোলো। ডালটা ধরে ফেললো রানা, এক সেকেণ্ড ধরে রাখলো, তারপরই নিচু হলো। সপাং করে ছুটে গিয়ে হাসানের বুকে আঘাত করলো ডালটা। চোখের পলকে ধরাশায়ী হলো সে, আহত পশুর মতো দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে। দেখার জন্যে থামেনি রানা, রোয়েনাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে ঢালের ওপর ফেলে দিলো ও। দেখলো, গড়াতে শুরু করেছে রোয়েনা। তারপর ঝেড়ে দৌড় দিলো

সামনের দিকে।

গর্জে উঠলো রিভলভার রানার পাশের একটা গাছের ছাল ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। পরবর্তী বুলেট দুটো মাথার ওপরের একজোড়া শাখা চিরে বেরিয়ে গেল। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রানা, আরেকটা বুলেট চোখে মুখে কাদা ছিটিয়ে দিলো। গড়ান দিয়ে চিৎ হলো ও, হাতের সেলাই কেটে যাওয়ায় তীব্র ব্যথায় অন্ধকার দেখলো চোখে। গুঙিয়ে উঠলো।

টলতে টলতে উঠলো রানা, ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে বাঁ হাতের ক্ষতটা। গোটা বাঁ হাতের আস্তিন লাল হয়ে উঠেছে তাজা রক্তে। ঝোপ ভেদ করে ছোটো একটা ডোবার কিনারায় বেরিয়ে এলো ও। ঝর্ণা থেকে নেমে এসে একটা বড়গর্তে জমেছে কাঁচের মতো স্বচ্ছ পানি।

আরো দুটো গুলির আওয়াজ হলো, কানের কাছে মৌমাছির গুঞ্জন শুনলো রানা। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে পানিতে পড়লো ও।

পানি থেকে মাথা তুললো রানা। ঝোপ বিস্ফারিত হলো, ডোবার কিনারায় বেরিয়ে এলো হাসান। হাঁপাচ্ছে সে, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। রানাকে ডোবায় দেখে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করলো সে। রিভলভার ধরা হাতটা তুললো, লক্ষ্য স্থির করলো সাবধানে, প্রচুর সময় নিয়ে।

গুলি করলো হাসান। খালি চেম্বারে আঘাত করলো হ্যামার, ক্লিক করে আওয়াজ হলো। রানার দিকে তাকিয়ে থেকেই রিভলভার পকেটে ভরলো হাসান, কোমর থেকে বের করলো একটা ছুরি। হাতটা তুললো সে, ক্লিক করে বেরিয়ে এলো

ফলাটা। ধীরে ধীরে পানিতে নামলো হাসান। রানার দিকে তাকালো।

ডোবার তলা থেকে একটা পাথর তুললো রানা। মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে দিলো হাসানের দিকে। আধ সের ওজনের পাথর, সবেগে ছুটে গিয়ে হাসানের বুকে লাগলো। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো হাসান। টলতে টলতে পিছু হটলো সে, ছুরিটা হাত থেকে পড়ে গেছে।

এক কি দেড় গজ দূরে পানিতে পড়েছে ছুরিটা। স্বচ্ছ পানি, পরিষ্কার দেখা গেল। পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে ডিগবাজি খেয়ে ওটার দিকে হাত বাড়ালো রানা। ছুরির হাতলটা মুঠোয় পেয়ে আবার এক পাক ঘুরতে শুরু করলো, এই সময় হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়লো হাসান। ঘ্যাঁচ করে তার পেটে ঢুকে গেল ধারালো ফলা।

ধীরে ধীরে সিধে হলো হাসান, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো রানার দিকে। ছুরিটা কোমরে গুঁজলো রানা, এগিয়ে গেল একটু, যেন হাসানকে সাহায্য করতে চায়। দুম করে তার কানের নিচে একটা ঘুসি মারলো ও, ঝপাৎ করে পানিতে পড়লো হাসান।

পানি থেকে অজ্ঞান দেহটা ডাঙায় তুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করলো রানা। ফড় ফড় করে হাসানের শার্ট ছিঁড়ে বেঁধে ফেললো গর্তটা, বন্ধ হয়ে গেল রক্ত। ক্ষতটা খুব গভীর না হলেও, চিকিৎসা পেতে দেরি হলে হাসানকে বাঁচানো কঠিন হবে। এদিক ওদিক তাকিয়ে অসহায় বোধ করলো রানা।

রোয়েনাকে কোথাও দেখা গেল না। অগত্যা ডান কাঁধে হাসানকে তুলে নিলো ও। বাঁ হাতটা কোনো কাজে আসছে না, একটু ঝাঁকি লাগলেই মনে হচ্ছে নতুন করে আগুন জ্বলে উঠছে।

জঙ্গলের প্রায় কিনারায় চলে এসেছে রানা, একটা ঝোপের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকতে দেখলো রোয়েনাকে। কাদা-পানি লেগে ভূতের মতো চেহারা হয়েছে তার। রানাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো সে। 'হায় হায়! মিঃ নাহিদ, ওটাকে আপনি আবার কাঁধে করে বয়ে আনছেন কেন?'

'আমার ভাই,' বললো রানা। 'ব্রেন ওয়াশ করে কাউন্ট ওর সর্বনাশ করেছে। চিকিৎসা করালে নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলালো রোয়েনা। রানার হাত ধরে ঝাঁকি দিলো সে, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো রানা।

'তাড়াতাড়ি, মিঃ নাহিদ, তাড়াতাড়ি! বোঝাটা নামান। জেটিতে পৌঁছুতে হলে···।'

রোয়েনার দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা, চেহারা বিকৃত হয়ে আছে। 'জেটিতে? কেন?'

'ওরা চলে যাচ্ছে যে! আপনিই তো বললেন ফ্লো-কে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওদের বাধা দিতে হবে না?'

ডান হাত দিয়ে রোয়েনার কাঁধ ছুঁলো রানা। 'সলোমন স্বেচ্ছায় যাচ্ছে, রোয়েনা। কাউন্টকে সে পর্তুগালে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। বিনিময়ে স্বাধীনতা আর ডায়মণ্ডের অর্ধেকই নয়, চাইলে চাকরিও পাবে।'

হেসে উঠলো রোয়েনা—এই প্রথম তাকে হাসতে দেখলো রানা। 'কি বলছেন! জো নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যায়নি। আমাকে ফেলে যেতেই পারে না ও!'

'বোকার স্বর্গে বাস করছো তুমি, রোয়েনা,' কঠিন স্বরে বললো রানা। 'সলোমন জানে এখানে আমাদের খুন করা হবে। সব জেনেশুনেই চলে যাচ্ছে ও। তার জীবনে তোমার কোনো জায়গা ছিলো না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই সহজ সত্যটা বুঝতে পারছো না কেন?'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন!' চেহারায় মরিয়া একটা ভাব নিয়ে বললো রোয়েনা। 'আমি আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।' কাঁধ থেকে রানার হাতটা ঝাপটা দিয়ে ফেলে দিলো সে। 'যেতে দিন আমাকে। আপনি না পারেন, আমি ওকে সাহায্য করবো।'

'পৃথিবীর কোনো লোক জো সলোমনকে আর সাহায্য করতে পারবে না এখন।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল রোয়েনা। রানার গলায় এমন কিছু একটা রয়েছে, স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে সে। চোখের সামনে হাত-ঘড়িটা তুললো রানা।

'লিমপেট মাইন, রোয়েনা। আমি মিথ্যে বলেছিলাম, ওটাকে নিউট্রাল করিনি। ম্যাক্সিমাম টাইমে সেট করেছি—বারো ঘণ্টায়। ওটার কথা মনে রেখেই এতোক্ষণ এতো কিছু সহ্য করার শক্তি পেয়েছি আমি।'

ধীরে ধীরে এদিক ওদিক মাথা নাড়লো রোয়েনা। তার

চেহারায় রাজ্যের আতংক ফুটে উঠলো। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। দু'হাত দিয়ে রানার পাঁজরে ধাক্কা দিলো সে, কাঁধে হাসানকে নিয়ে দড়াম করে ভিজে ঘাসের ওপর পড়ে গেল রানা। ঘুড়ে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটলো রোয়েনা।

কয়েক সেকেণ্ড নড়ার শক্তি পেলো না রানা। চোখ মেলার পর মনে হলো, কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওর জ্ঞান ছিলো না। উঠে বসে হাসানকে পরীক্ষা করলো ও। পালস মোটামুটি স্বাভাবিক। বাঁধনটা আবার শক্ত করে বাঁধার পর নতুন করে রক্ত পড়াও বন্ধ হলো।

দাঁড়ালো রানা, মনে হলো টলে পড়ে যাবে। হাঁটতে গিয়ে দেখলো, খোঁড়াচ্ছে। ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে, মাটিতে পা ফেললেই স্যাঁৎ করে পাঁজর পর্যন্ত উঠে আসছে ব্যথা।

আশ্চর্য, তবু ছুটতে লাগলো রানা। মুখ বিকৃত হয়ে আছে, ব্যথায় পানি বেরিয়ে আসছে চোখ ফেটে, খোঁড়াচ্ছে, গোঙাচ্ছে।

ঝম-ঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো। তবে কুয়াশা আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে গেছে। বাড়ির উল্টো দিকের ঢাল বেয়ে গর্তের মাথায় উঠে এলো রানা। দূরে দেখা গেল ক্ষুদে হারবার। জেটির সাথে এখনো বাঁধা রয়েছে বোটটা।

গোল্ডেন সানের বো-তে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবীর চৌধুরী, পাশে সলোমন। এক দুই করে গুণলো রানা—ছ'টা ড্রাম। সবগুলোকে এক করে মোটা রশি দিয়ে বাঁধছে জনি, মুখে সেই অর্থহীন হাসি।

পাহাড় থেকে অর্ধেক পথ নেমে গেছে রোয়েনা। এখনো প্রাণপণে ছুটছে সে, জীবনে বোধহয় এতো জোরে আর কখনো ছোটেনি। মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় নেই, কারণ ওর নাগাল পাবে না রানা। তবু দাঁতে দাঁত চেপে ঢালু পথ বেয়ে নামতে শুরু করলো ও।

সলোমনের নাম ধরে একবার ডাকলো রোয়েনা। পরিষ্কার, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। বোট থেকে তিনজনই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। পথের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল রোয়েনা। চিৎকার করছে, হাত নাড়ছে, ছুটছে। ল্যুগার তুললো সলোমন, তাক করলো ওর দিকে।

জেটিতে পা দিলো রোয়েনা। ঠিক এমনি সময় বিকট আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো গোল্ডেন সান। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বজ্রপাতের মতো ফিরে এলো প্রতিধ্বনিগুলো। এক সেকেণ্ড পর টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে উঠলো আগুন, পেট্রল ড্রামগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। আগুনের শিখায় ভর করে ধীরগতি ছবির মতো আকাশের দিকে উঠে গেল খোলের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ।

মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে উড়ে গেল আগুন ধরা আবর্জনা, মাথা নিচু করে আত্মরক্ষা করলো রানা। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলো ও।

'রোয়েনা!' চিৎকার করলো রানা। 'রোয়েনা, তুমি কোথায়?'

কোনো সাড়া এলো না। লেলিহান আগুনের শিখা চড়চড়

করছে, কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে জেটি। তেলের পোড়া গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। তিনজনকে নিয়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে গোল্ডেন সান। ইস্পাতের কিছু অংশ, আর সুপার-স্ট্রাকচার বাঁকা হয়ে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা পেয়েছে। শুধু ওগুলো দেখেই বোঝা যায়, একটু আগে ওখানে একটা বোট ছিলো।

তবে রোয়েনা আছে। জেটির মাঝামাঝি জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বেচারি। আশ্চর্য, আঁচড়ের একটা দাগ পর্যন্ত লাগেনি তার গায়ে কোথাও। শুধু হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা গুলির ফুটো।

রোয়েনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে। পালস নেই। তার বুকে মাথা রাখলো রানা।

হার্ট চলছে না।

'বোকা মেয়ে।' বিড়বিড় করে বললো রানা। ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের কাছ থেকে পানি মুছলো সে।

রোয়েনার লাশের পাশেই বসে রইলো রানা।

রোয়েনার জন্যে সব শেষ হয়ে গেছে। আর কাউকে ভালো-বাসতে হবে না। কারো ওপর নির্ভর করতে হবে না। কারো আশ্রয় পাবারও দরকার নেই তার। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গেছে সে। ওর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু রানার কাজ ফুরোয়নি।

যে-কোনো মুহূর্তে রয়্যাল নেভির এম. টি. বি. এসে পড়বে। প্রথম কাজ স্ট্রেচারে করে হাসানকে তাতে তোলা। যতো তাড়া-তাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে ওকে।

এক এক করে আরো কাজের কথা মনে পড়লো রানার। রোয়েনাকে কবর দিতে হবে। ফ্রাইডেথর্পের প্রিন্সিপাল অফিসার ডানিয়েল বুকারের কথা বলতে হবে বি. এস. এস. চীফ উইলিয়াম ম্যানফ্রেডকে। ঢাকা হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে হবে—কবীর চৌধুরী মারা গেছে।

এবার আর কোনো সন্দেহ নেই, মরে গিয়ে সবাইকে বাঁচিয়েছে লোকটা।

দূরে কোথাও থেকে ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এলো। চারপাশে তাকালো রানা।

এম. টি. বি.-র ক্যাপটেন জেটিতে পা দিয়ে রানাকে ওখানেই দেখতে পেলো। রোয়েনার একটা হাত ধরে বসে আছে চুপচাপ। চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি।